আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার একসপ্ততিতম গ্রন্থ

নারীর প্রাণ

শ্রীবামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
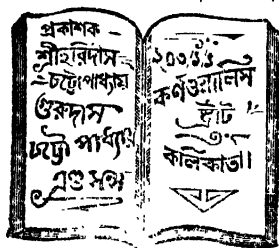
ভাদ্র—১৩৩০

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কৈফিয়ৎ

আমার দুর্ভাগ্য যে আজ যে প্রয়াস নিয়ে আমি সাহিত্য জগতের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হচ্ছি, এটাতে আমি নিজেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হ'তে পারি নাই। আর এখানা আমার প্রথম প্রয়াসও নয়। সবাই হয়ত আশ্চর্য্য হয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন যে, এখানা তবে প্রথম বের হচ্ছে কেন? আকারে ছোট বলেই হউক বা এখানার ভিতর নতুন কিছু ঢোকাবার চেষ্টা করিনি বলেই হউক, এ বইখানা বের কর্‌তে আমার বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় নাই। আমার প্রথম লেখা, যেখানা শেষ করে আমি মনে মনে প্রীতিলাভ করেছিলাম, সেখানা প্রকাশ কর্‌বার আজ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। আমার বন্ধুবান্ধব ও মুরুব্বিরা সেখানা পড়ে সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই কর্‌তে পারেন নাই। তাঁদের বইখানা ভাল লাগ্‌লেও ওর ভিতরে এমন একটা ভাবের ধারা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, যা তাঁদের মতে বাঙ্গালার সমাজ এ অবস্থায় সহ্য করে উঠ্‌তে পার্‌বে কি না সন্দেহ। সুতরাং সে বইখানা আমার হাতেই

রইল। সহজ মতকে অবলম্বন করে লোকের মনোরঞ্জন কর্‌তে পার্‌লাম না বলে আমি দুঃখিত, তবে লোকের মনোরঞ্জন সম্বন্ধে এখনও আমি হতাশ হই নাই। যে জিনিষটা আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয় সেটা প্রচার কর্‌ব, আর সমস্ত মতামত অগ্রাহ্য করে, এই আমার আকাঙ্ক্ষা; আমার প্রবল আস্থা আছে যে শেষ পর্য্যন্ত এ উপায়েই আমি লোকের মনোরঞ্জন কর্‌তে সক্ষম হ'ব। আমার এ ছোট বইখানা, যাতে আমি নিজেই সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ কর্‌তে পারি নাই, তা যে লোকের কাছে আদরণীয় হবে সে স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। তবে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ যদি আবর্জ্জনা মনে করে এটা দূরে না ফেলে দেন, তবেই আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান কর্‌ব। ইতি

নিবেদক

শ্রীবামাপ্রসন্ন

উৎসর্গ

মা পাঁপড়ি!—

আজ প্রায় দুবছর হলো তুই আমাদের মাঝে এসেছিস্; এসে এর ভিতরে বুকের মাঝে এত বড় একটা স্থান অধিকার করে বসেছিস্, যা বুঝি দুহাজার বছরেও সম্ভবপর নয়। আজ মনে হচ্ছে না যে নতুনের মাঝে তোকে পেয়েছি। তুই যে আমার কাছে চিরপুরাতন কোন দিন তোকে ছাড়া জীবন চলেছে সে কথাটা আজ বিশ্বাস পর্য্যন্ত হয় না। তোর আগমনে আমার সব বদলে গেছে, বক্ষের আগল ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে অফুরন্ত উদ্যম ছড়িয়ে পড়েছে। তোর ঐ আধ আধ অবোধ্য ভাষা আমার চিন্তার জগতে অনন্ত ভাবের ইঙ্গিত এনে দিচ্ছে। বয়সে তুই যতই ছোট হস্ না কেন, আমার কাছে যে তুই কতখানি বড়! তোর ভিতরের মস্ত বড় একটা প্রাণের সাড়া আমার জীবনের গতিকে নিরন্তর পথ দেখিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমার এই প্রথম কাঁচা লেখা তোর কচি হাত দুখানিতে তুলে দিলাম।

তোর বাবা

নারীর প্রাণ

বা

জয় পরাজয়

১

যৌবনের মোহন স্পর্শে রূপলাবণ্যে গীতার সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিল।

সবাই তাহাকে পরমা সুন্দরী বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। অসামান্যা রূপসী গীতা, এমন রূপ শুধু বড় ঘরেই শোভা পায়; কিন্তু বড় বলিতে যাহা বোঝায় গীতার পিতা তাহার কিছুই নয়। দরিদ্রতার ভিতর দিয়া তাঁহাকে ক্লায়ক্লেশে জীবনটা টানিয়া লইতে হইয়াছে। লেখাপড়া যাহা কিছু তিনি শিখিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত সামান্য না হইলেও ক্ষুদ্র মাষ্টারী ছাড়া আর কিছুই তাঁহার ভাগ্যে জোটে নাই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপর তাঁহার নজরটা চিরদিনই বেশী রকম ছিল বলিয়াই যেন লক্ষ্মী চিরদিনই তাঁহার উপর বিমুখ হইয়াছিলেন।

জীবনে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের একটা বাদ আছে, সুতরাং যাহা কপালে জুটিয়াছে তাহা লইয়া পড়িয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেদিন হইতে বাকী জীবনটা নির্ব্বিবাদে কাটাইতে পারিবেন বলিয়া একটা আশা ও তৃপ্তি তিনি মনের মধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদেবী তত সহজে তাঁহাকে ছাড়েন নাই।

তাঁহার দুইটি সন্তান, বড়টি ছেলে। ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহাকে দিয়া নিজের জীবনের ব্যর্থ সাধটা মিটাইয়া লইবেন, এমন একটা আশা তাঁহার পিতৃহৃদয়ের মস্ত বড় একটা স্থান জুড়িয়া ছিল। ছেলে বড় হইয়া ষ্টেটস্ স্কলারসিপ্ লইয়া বিলাত যাইবে ও সেখান হইতে সিভিলিয়ান্ হইয়া আসিবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও সেজন্য তিনি প্রথম হইতেই ছেলেকে তেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন। মাষ্টারী করিয়া ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার বড় নিম্ন ধারণা হইয়া গিয়াছিল; কুসংসর্গে মিলিয়া পাছে ছেলেটা নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য তিনি ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি পর্য্যন্ত করেন নাই, নিজেই তাহার পাঠের ভার

গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, পাছে তাঁহার অলক্ষিতে ছেলে খারাপ দলে ভিড়িয়া পড়ে, এ ভাবনায় তিনি সর্ব্বদা তাহাকে চোখে-চোখে রাখিতেন। কিন্তু যতই কঠিন করিয়া ছেলেকে বাঁধিতে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার সমস্ত ছিঁড়িয়া পালাইবার ইচ্ছা বাড়িতে লাগিল। একদিন এক সুযোগে পিতার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাঁহার যৎসামান্য পুঁজিপাটা লইয়া সে প্রস্থান করিল, পিতার আশার মূলে কুঠারঘাত হইল।

কিছুদিন নানারকম সংশ্রবে ঘুরিয়া, নানাপ্রকার অকাজ কুকাজ করিয়া ছেলে অবশেষে বাড়ীতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুঝিয়াছেন যে তাহাকে দিয়া কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, কোন রকমে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার কল্যাণে পিতার অনেক টাকা ধার হইয়াছিল।

নিজের কর্ম্মের ফল হাতে হাতে পাইয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গীতাকে তিনি সর্ব্ব-প্রকার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাকে তিনি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, ও সব বিষয়েই তাহার একটা

নিজের ইচ্ছা ছিল ও ইচ্ছামত কাজ করিতেও তাহাকে কোন দিন কোন বাধা দেওয়া হয় নাই।

গীতা ষোল বছরে পা দিয়াছে, সে এখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে। পিতার অর্থের সঙ্গতি না থাকায় তাহাকে বাড়ীতে গান-বাজনায় উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু গীতা স্কুলে ওস্তাদের কাছ হইতে গান ও এস্‌রাজ, সেতার ইত্যাদি বাজনা বেশ ভাল রকমই শিখিয়াছিল। স্কুলে তাহার admirerএর দল বেশ ভারি ছিল, তাহাদের মধ্যে দু চারজন খুব বড় লোকের মেয়ে। পূজায় ও বড়দিনে বন্ধুদের নিকট হইতে অনেক presents গীতা পাইত। তাহার বন্ধুদের মধ্যে একজন তাহাকে একটা চমৎকার সেতার দিয়াছিল। স্কুলের কোন উৎসব উপলক্ষে অভিনয়াদি হইলে গীতাকেই প্রধান ভূমিকা লইতে হইত, তাহার কারণ গীতা গায় ভাল, অভিনয়েও তাহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে ও সর্ব্বোপরি স্কুলে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। স্কুলে তাহাকে সবাই ভালবাসিত, শিক্ষয়িত্রীরা তাহাকে আদর করিত, ছাত্রীরা তাহার সহিত মিশিতে পারিলে নিজকে ধন্য জ্ঞান করিত। এই সব নানা কারণেই স্কুলে তাহার এত প্রসিদ্ধি।

তাহার বাসায় বহু যুবক আসা যাওয়া করিত; তাহার মধ্যে অনেকেরই অবস্থা বেশ ভাল। তাহার পিতার ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে একজনকে গীতা বাছিয়া লয় ও তাহার উপরই তাহার জীবনটা নির্ভর করে। অভ্যাগত সকল যুবকই গীতার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা যে কেহ গীতার পাণিগ্রহণ ভাগ্য বলিয়া গণ্য করিত। গীতার সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে সবার মধ্যেই একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত; কে বেশী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে মস্ত বড় প্রতিযোগিতা চলিত।

কুশল গীতাদের পাড়াতেই থাকে। সে নিঃস্ব পিতার নিঃস্ব পুত্র। তাহার যাতায়াত গীতার পিতার কাছে তত ভাল লাগিত না, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও তিনি কোন দিন পারেন নাই। কুশল যদিও স্কলার, তবু সবেমাত্র বি এ পড়ে, উপযুক্ত হইতে তাহার এখনও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। মুরুব্বির জোর তাহার নাই, পাশ করিয়া সামান্য চাকরী করিয়া তাহার নিজের জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহাও যে সে একমাত্র নিজের কাজে লাগাইতে পারিবে তাহা নহে, কারণ তাহার পিতামাতা

আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার রোজগারের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

এমন ছেলের হাতে যে তিনি কখনই কন্যাকে দিতে পারিবেন না, তাহা গীতার পিতা জানিতেন; তাঁহার বিশ্বাস যে গীতাও কখন এমন ছেলের উপর স্নেহ স্থাপন করিতে পারিবে না। তবে সে নিত্য আসে যায় কেন?

কিন্তু কুশল প্রত্যহ গীতাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিত; সেই ছিল গীতার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত। গীতার রূপ গুণ তাহাকেই সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। আর গীতারও সব চেয়ে তাহার দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশী. কিন্তু তাহার মধ্যে সহানুভূতি ছাড়া যে আর কিছু আছে, সে কথা গীতা বুঝিতে পারে নাই।

২

স্কুলে, বিশেষতঃ কলেজে বড় বড় মেয়েদের মধ্যে বিবাহের আকাঙ্ক্ষাটা প্রায়ই পাইয়া বসে। গীতা দেখিত যে অনেক মেয়ে বিবাহের জন্য পাগল হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে বিবাহ করিতে পারিলে উত্‌রাইয়া যায়; তাহারা যে পড়িতেছে তাহা কেবল বিবাহ কপালে

জুটিতেছে না বলিয়া, ও স্কুল কলেজে পড়া বিবাহাদি ব্যাপারের একটা পাশপোর্ট বলিয়া। গীতা দেখিয়া দুঃখিত হইল, এ মেয়েদের সবাই তাহাদের ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দু মেয়ে যাহারা পড়িত, তাহারা পড়াশুনার জন্যই কলেজে আসিত, বিবাহের বাজারে সুবিধার জন্য নহে। তাহাদের পড়াশুনার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে। গীতাকে তাহার বন্ধুবর্গ এই বলিয়া আশ্বাস দিত যে তাহার আর ভাবনা কি? এমন রূপলাবণ্য লইয়া সে যাহাকে পছন্দ করিবে, সেই তাহাকে গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া আসিবে। রাজ-রাজড়ার ঘরে তাহার যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। প্রত্যুত্তরে গীতা বলিয়াছে যে বিবাহে তাহার মোটেই আসক্তি নাই, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনই তাহার আজীবন সাধ। যদি কখন একান্ত সে বিবাহ করেই, তবুও সে কখনও বড়লোক বিবাহ করিবে না। তাহার স্বাধীন সত্ত্বা সে পরের পায়ে বিকাইয়া দিতে পারিবে না। বড়লোকেরা হয় ত তাহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিবে; ও তাহাকে লাভ করা ভাগ্য বলিয়াই গণনা করিবে; কিন্তু ততদিন, যতদিন না তাহাকে লাভ করা যায়। একবার তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই তাহাদের

সমস্ত আকাঙ্ক্ষা উবিয়া যাইবে, তাহার সঙ্গ আর তাহা-দের কাছে তত প্রার্থনীয় মনে হইবে না। কিন্তু সে যদি গরীব কাহাকেও বিবাহ করে, যাহার প্রতিপদে তাহার সাহায্য প্রয়োজন, যাহার হয়ত তাহার উপার্জ্জনের উপর নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে, তবে সে ত কখনই তাহাকে সাধারণ বলিয়া মনে করিতে পারিবে না; তাহার কাছে চিরদিনই তাহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে: স্বামী অপেক্ষা স্বল্প প্রাধান্যের কাজ করিয়া, স্বল্প প্রধান হইয়া সে এক সংসারে বাস করিতে কখনই পারিবে না; সে চায় সাম্য, আর সে সাম্য সমান সমান কাজ না করিলে কখনই সম্ভব হয় না। স্বামী টাকা আনিবে, আর সে বাড়ী ঘর দেখিবে, তাহা হইলে তাহাদের মাঝে সমান ভাব কখনই থাকিতে পারে না, ইহাই ছিল তাহার ধারণা।

কথাটা মুখে মুখে চারিদিকে রটিয়া গিয়াছিল, কুশলের কানেও প্রকারান্তরে তাহা পৌঁছিয়াছিল ও শুনিয়া সে যথেষ্ট উৎসাহান্বিত হইয়াছিল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা কথাটা বলিয়াছে। গীতার পিতা যখন কথাটা শুনিলেন, তখন

তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি কি আশা করিয়াছিলেন, আর কিই বা হইতে চলিয়াছে! কিন্তু হাল তিনি ছাড়িলেন না! খেয়ালের ঝোঁকে মেয়ে কথাটা বলিয়াছে মনে করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার মেয়ে নিশ্চয়ই মনে মনে তেমন ভাবে না, উপযুক্ত ধনী পাত্র পাইলে তাহাকে গ্রহণ সম্বন্ধে যে তাঁহার কন্যা আপত্তি তুলিবে না, সে সম্বন্ধে তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু সে দিনের সে কথার পর তিনি কন্যার উপর নজরটা একটু বাড়াইয়া দিলেন; তাহাকে আর আগের মত তেমনি একলা ছাড়িয়া দিতেন না; তাহাকে যত্ন করিয়া বড়লোকের কাছে মিশ খাওয়াইতে তিনি চেষ্টা করিতেন। কুশল আসিলে তিনি আজকাল বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু প্রেম-বিভোর যুবক সে সব কিছুই গ্রাহ্য করিত না। বড়লোক পাইলে তিনি গীতাকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কাছে বসাইয়া রাখিতেন ও এক সময়ে গীতাকে তাহার কাছে একাকী রাখিয়া তিনি সে ঘর পরিত্যাগ করিতেন। তিনি চলিয়া যাইবার অনতিপরেই গীতা কাজের অছিলায় সে ঘর ত্যাগ করিত ও কুশলের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত পিতার ব্যবহার কুশলের উপর যতই কঠিন হইতে লাগিল; কন্যার হৃদয়

ততই তাহার পানে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। যে জিনিষটা এতদিন অঙ্কুর রূপে তাহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, পিতার ব্যবহারে তাহা ফল মূলে শোভিত হইয়া উঠিল, গীতা কুশলকে ভাল বাসিয়া ফেলিল।

৩

নির্ম্মাল্যকুমার জনৈক হাইকোর্টের জজের একমাত্র পুত্র। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া বছর পাঁচেক সে হাইকোর্টেই যাতায়াত করিতে-ছিল, কিন্তু গত বৎসর পিতার মৃত্যুর পর সে তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছে। অর্থের তাহার আর প্রয়োজন ছিল না; পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে অভাবের কিছুই ছিল না, বরঞ্চ অভাব ছিল তাহা ভোগ করিবার লোকের। রাতদিন মোটর দাবড়ান নির্ম্মাল্যের শৈশব হইতেই একটা মস্ত বড় সখ ছিল, কিন্তু আশু আর এক নতুন সখে সে মাতিয়া উঠিল। আমাদের দেশে নাটকের চলন নাই, সাধারণ নাট্যশালায় এ বারবনিতা ছাড়া অভিনয় চলে না। সখের থিয়েটারে পুরুষদের মেয়েছেলের ভূমিকা লইতে হয়; তাহাতে আর্ট একেবারে নষ্ট হয়। এদিকে

একটা সংস্কার করিবার জন্য তাহার ঝোঁক চাপিয়া বসিল। সে ঠিক করিল যে ভদ্রলোকের পুরুষ মেয়ে লইয়া একটা অভিনয় করিবে। এ কার্য্যে সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। স্কুলে গীতার অভিনয়-খ্যাতির কথা সে শুনিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে অভিনয়ে যোগ দিবার জন্য সে তাহার পিতাকে অনুরোধ জানাইল। মনে মনে তাঁহার আপত্তি থাকিলেও কন্যা যদি এ সুযোগে এত বড় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, এই আশায় গীতার পিতা সানন্দে তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন; ঠিক হইল গীতা অভিনয়ে যোগদান করিবে। কোন চেষ্টার ত্রুটি নির্ম্মাল্য করে নাই, তাই তাহার অভিনয়ের জন্য পুরুষ ও মেয়ের অভাব হইল না; স্থির হইল রবি-বাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় হইবে।

চিত্রাঙ্গদার পার্টের প্রথম ভাগটা অন্য একজন মেয়ের উপর দেওয়া হইয়াছিল। মদন হইতে বর লাভ করিয়া যখন চিত্রাঙ্গদা অসামান্যা রূপবতী হইয়া উঠিল, তখন হইতে গীতাই ভূমিকা গ্রহণ করিবে ঠিক হইল। অর্জ্জুনের ভূমিকা লইয়াছিল নির্ম্মাল্য স্বয়ং। যথাদিনে মহাসমারোহে অভিনয় হইয়া গেল। সরোবরের পারে চিত্রাঙ্গদার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে অর্জ্জুন মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

কিন্তু সে মোহটা কি শুধু অর্জ্জুনের? আজ অর্জ্জুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ নির্ম্মাল্যরও অভিনয়ের মাঝে ঠিক তেম্‌নি একটা মোহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। বাসন্তী রঙের একখানা সাড়ী পরিয়া, ফুলের পোষাকে বক্ষ আবৃত করিয়া স্থির কটাক্ষে গীতা তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। নির্ম্মাল্যও দুনয়ন ভরিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল; তাহার প্রাণ আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া উঠিল, অর্জ্জুনের যে কি মনের ভাব হইয়াছিল সে তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল।

নির্ম্মাল্যের অভিনয় সেদিন বড়ই সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। অভিনয়ান্তে সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, যে এমন স্বাভাবিক ও সুন্দর অভিনয় করিতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। গীতার অভিনয়ও চমৎকার হইয়াছিল; কিন্তু তাহা নির্ম্মাল্যের মত অতটা স্বাভাবিক হয় নাই। কুশল অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিল; গীতা ও নির্ম্মাল্যকে এম্‌নি ভাবে দেখিয়া তাহার প্রাণ ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিতে-ছিল। যদিও সে জানিত যে ইহা অভিনয় মাত্র, নির্ম্মাল্য শুধু অর্জ্জুনের মনের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে ও গীতা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা অভিনয় করিতেছে, সুতরাং তাহারা যাহা করিতেছে ইহাতে তাহাদের নিজের কিছুই

নাই, তবুও সে নির্ম্মাল্যের ব্যবহার সহজ ভাবে লইতে পারিল না ; তাহার মনে হইতেছিল যে নির্ম্মাল্য আজ তাহার বক্ষে আঘাত করিয়া তাহার রত্ন ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে।

কিন্তু এই অভিনয় নির্ম্মাল্যের জীবন-ধারায় সম্পূর্ণ নতুন প্রবাহ আনিয়া দিল। এতদিন যাহার সাড়া তাহার বুকের কোন যায়গায়ই পাওয়া যায় নাই, সেদিন এক দিনে তাহা আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বসিল ; সে বুঝিল যে তাহার শূন্য বক্ষ আজ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; ও তাহা ভরিয়া আছে—প্রাণমাতানো রূপ লইয়া চিত্রঙ্গদা বা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় গীতার সে অসামান্য রূপের আকর্ষণ ও মাধুর্য্য।

সেদিন অভিনয়ের পর কুশলের সঙ্গে গীতার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুশলের বিষাদমাখা মুখ দেখিয়া গীতা স্নেহভরে তাহার হাত নিজ হাতে লইয়া, তাহার এমন ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কুশল আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার দুনয়ন বহিয়া অশ্রু প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল ; গীতা পরম আদরে আঁচল দিয়া সে অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিল। কুশলের ধমনীর রক্ত নাচিয়া উঠিল, সে দুই হাতে গীতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার ওষ্ঠে প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

এক করিতে অন্য হইয়া বসিল। নির্ম্মাল্য সমাজের চিন্তার ধারা সংস্কার করিতে যাইয়া নিজের হৃদয়-অভ্যন্তরটা ঝাড়িয়া নতুন রঙ্গে সংস্কার করিয়া ফেলিল; সেখানে সেদিন হইতে গীতার মানস-প্রতিমা সংস্থাপিত হইয়া রহিল। কেমন করিয়া সে গীতার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারে, তখন হইতে তাহাই হইল তাহার প্রধান চিন্তা। অভিনয়ের জন্য তাহাকে ভিক্ষা করিয়া আনিতে সে তাহাদের বাড়ী গিয়াছিল; অভিনয় হইয়া গিয়াছে, এখন কি বলিয়া সে তাহাদের ওখানে যাতায়াত করিবে? আর তাহা করিলে উহারাই বা মনে করিবে কি? অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিল যে, অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদ দিতে সে একবার গীতার বাড়ীতে যাইতে পারে, তবু ত আর একবার প্রাণ ভরিয়া তাহার মানস-প্রতিমাকে দেখা হইবে!

মনে হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই কাজ। নির্ম্মাল্য সেদিনও গীতার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিনয়ের জন্য যথাসাধ্য ধন্যবাদ করিল। গীতার সাহায্য না পাইলে সেদিন অভিনয় হইতেই পারিত না, একমাত্র তাহার

অভিনয়-চাতুর্য্যেই সেদিন অভিনয় এমন সাফল্য লাভ করিয়াছিল, এ সব নানা কথায় সে গীতার প্রশংসা করিতে লাগিল। নির্ম্মাল্যের কথাগুলি গীতার কাছে অযথা প্রশংসার আধিক্য বলিয়া মনে হইল,' সে জানিত যে সেদিন নির্ম্মাল্যের অভিনয় তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। নির্ম্মাল্যের কথায় গীতা যথার্থই সন্তুষ্ট হইতে াারিল না।

গীতার পিতা নির্ম্মাল্যকে পাইয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। গীতা যদি বুদ্ধি খাটাইয়া তাহার সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে তাহাকে পাওয়া তেমন কষ্টকর হইবে না। তিনি সেদিন নির্ম্মাল্যর জন্য তাঁহার সাধ্যাতীত প্রচুর জলযোগের আয়োজন করিলেন ও তাহাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ীতে রাখিয়া, যাইবার সময় তাহার কাছ হইতে কথা লইয়া ছাড়িলেন যে, এবার হইতে সে মাঝে মাঝে সেখানে এক একবার পায়ের ধূলা দিবে। নির্ম্মাল্য সেদিন যতক্ষণ ছিল তার মধ্যে গীতার একবারও সে স্থান ছাড়িয়া উঠিবার সাধ্য হয় নাই; যতবারই সে উঠিতে গিয়াছে ততবারই তাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করিয়াছেন, নির্ম্মাল্য একা বসিয়া থাকিবে, সে কি রকম! গীতা একবার তাহার বাবাকে সেখানে

বসিয়া থাকিতে বলিয়া, উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার ডাক পড়িল, তাহার পিতা বিশেষ কাজে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহাকেই নির্ম্মাল্যের কাছে বসিতে হইবে। বস্তুতঃ, তাহার পিতার কোন কাজই ছিল না, শুধু গীতাকে নির্ম্মাল্যের কাছে বসাইয়া রাখিতেই তাঁহার এই অছিলা। ফলে নির্ম্মাল্যের খুবই সুবিধা হইয়াছিল, সে যে জন্য আসিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, যতক্ষণ সে ছিল ততক্ষণ সে দুনয়ন ভরিয়া গীতাকে দেখিতে পারিয়াছে, কিন্তু গীতা তাহার পিতার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল।

সেদিন হইতে নির্ম্মাল্য প্রতিদিন গীতাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। তাহার কথাবার্ত্তায় গীতা সন্তুষ্ট হইল ও ক্রমেক্রমে তাহার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করিতে লাগিল। প্রথম দিন তাহার সঙ্গ তাহার মনে যে বিরক্তি আনিয়া দিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা মুছিয়া গেল; এখন তাহার সঙ্গ গীতাকে বরঞ্চ আনন্দই প্রদান করিত। কিন্তু যেদিন একটা কথার ফাঁকে সে জানিতে পারিল যে, তাহার পিতার ইচ্ছা তাহাকে নির্ম্মাল্যের হাতে সমর্পণ করা, ও নির্ম্মাল্যও গীতাকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, সেদিন হইতেই তাহার চিত্ত বিরক্তি ও বিদ্রোহে পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিল। সে কুশলকে ভাল বাসিয়াছে ; যদি কখনও বিবাহ করে তবে তাহাকেই করিবে, সে ছাড়া এ পৃথিবীতে কেই বা তাহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে ?

গীতা অদ্ভুত ধরণের মেয়ে। সে কুশলকে ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও সে কখন করে নাই, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের ইচ্ছা তাহার মনের মধ্যে কুশলকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। তবে কুশলের সহিত জীবন মিলাইলেও স্বাধীনতা কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। সেদিন কলেজে সে কথায় কথায় যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা যে কেবল খেয়ালের ঝোঁকে, তাহা নহে ; এ কথাটা সে অনেকবার ভাবিয়াছে ও ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই স্থির করিয়াছে। তাই সেদিন যখন সে শুনিল যে তাহাকে নির্ম্মাল্যের পায়ে বিকাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তখন তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, পৃথিবীর উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। কি উপায়ে যে ইহার প্রতিশোধ লওয়া যায়, সে শুধু তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেদিন হইতে এ বিষয়ে পিতা তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নির্ম্মাল্যকে পাওয়া যে পরম ভাগ্য, এমন লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিলে যে আজীবন অনু-

২

তাপ করিতে হইবে, এইরূপ নানা কথা অনবরত গীতার কর্ণে বর্ষিত হইতে লাগিল। গীতা নিস্পন্দে সকল শুনিয়া যাইত. কোন কথায় কিছু উত্তর করিত না। তাহার মৌন ভাব সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া তাহার পিতা উৎসাহে নাচিয়া উঠিলেন, নির্ম্মাল্যের কাছে তিনি বলিলেন যে তাঁহার ও কন্যার মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে ও নির্ম্মল্যকে লাভ করা যে পরম সৌভাগ্য তাহা গীতা নতমুখে স্বীকার করিয়াছে। বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। গীতার পিতা ভাবিলেন "শুভস্য শীঘ্রম্"। তাই তাড়াতাড়ি বিবাহ দিতে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মাল্যেরও বিলম্ব সহ্য হইতে ছিল না। ঠিক হইল আগামী মাসের প্রথম ভাগেই বিবাহ হইয়া যাইবে, ইতিমধ্যে যাহা সম্ভব বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫

সেদিন নির্ম্মাল্য আসিয়া বলিল "গীতা, এতদিন ভরসা পাইনি, বুঝে উঠ্‌তে পারিনি যে তোমার মনের ভাব কি, কিন্তু আজ তোমার বাবার মুখে শুনে আশ্বাস পেয়ে তোমাকে জানাতে এসেছি যে অভিনয়ে তোমার মোহন-

মূর্ত্তি দেখে আমি সেই মুহূর্ত্তেই তোমাতে আমার মনপ্রাণ সঁপেছি"! শুনিয়া গীতা স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার পিতা তাহাকে কি আশ্বাস দিয়াছেন ? গীতা কোন উত্তর করিতে পারিল না, তাহার মাথা ঘুরিতেছিল।

নির্ম্মাল্য বলিতে লাগিল "স্বপ্নেও ভাবিনি যে এত সৌভাগ্য আমার হবে। তুমি যে আমাকে গ্রহণ করতে চাইবে সে আশা আমি করতে পারিনি। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি ভাগ্যদেবী সত্যই আমার একান্ত সহায়। তোমার বাবার মুখে যেই শুন্‌লাম যে তুমি আমাকে চাও, তখন যে কি আনন্দে আমার প্রাণ নেচে উঠেছিল—"তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না, গীতা টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নির্ম্মাল্য অবাক্ হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল; সে বুঝিতে পারিল না, গীতার এ আচরণের অর্থ কি। শেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে বিবাহের পূর্ব্বে এরূপ আলোচনা বোধ হয় গীতা পছন্দ করে না, তাই-এম্‌নি ভাবে সে ঘর পরিত্যাগ করিল। লজ্জায় ও দুঃখে নির্ম্মাল্যের মন ভরিয়া উঠিল, ধীর পদক্ষেপে সে বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত ঘটনা গীতার সম্মুখে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পিতা মিথ্যা বানাইয়া নির্ম্মাল্যের কাছে

বলিয়াছে, নহিলে কি সাধ্য তাহার যে সে আজ তাহাকে এম্‌নি ভাবে অপমান করে। তাহার পিতা, এত আদরের পিতা, যাঁহার ভালবাসার কাছে সে তাহার এই ষোলবছর জীবনের জন্য ঋণী, তিনি কি একবারও তাহার অন্তরের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না? টাকার লোভে তাহাকে এম্‌নি ভাবে পরের কাছে বিকাইয়া দিতে সম্মত হইলেন! তাহার পিতা, যাঁহার সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা সে আজীবন পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তিনি কি না, টাকা দেখিয়া তাঁহার কন্যাকে বিলাইয়া দিতে উন্মুখ! তাঁহার কন্যার টাকার উপর এত স্পৃহা, একথা তিনি কেমন করিয়া মনে করিতে পারিলেন! কেমন করিয়া তিনি ভাবিলেন যে ধনবান কাহাকে বিবাহ করিলেই সে সুখী হইতে পারিবে? বিবাহেই তাহার প্রয়োজন নাই। তবে যদি একান্ত সে পিতার গলার কাঁটা হইয়াই থাকে, তবে তাহাকে নিজের ইচ্ছামত পতি নির্ব্বাচন করিতে দিলেই হইত। তাহার ত বৈভবের কোন প্রয়োজন নাই; এ সব কথা ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজনায় টলিতে টলিতে গীতা নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পৃথিবী তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছিল, সে নিজকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; উপুড় হইয়া বিছানায় পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কেহ তাহাকে দিয়া ঘরের দরজা খোলাইতে পারে নাই। সে রাত্রিতে কাহারও খাওয়া হইল না, গৃহ-জোড়া একটা বিষাদের ছায়া রহিল। রাত্রিতে গীতার চোখে ঘুম আসিল না, সে কেবল নিজের ভাগ্যচিন্তা করিতেছিল। এত বড় অত্যাচার আজ তাহার উপর হইতেছে, আর এ যজ্ঞের প্রধান নেতা তাহার পিতা। পিতা হইয়া কন্যার উপর তিনি এতটা অবিচার করিলেন! তাঁহার পিতৃহৃদয়ে কি একফোঁটা করুণারও স্থান নাই? তাঁহার কি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা নাই কিসে তাঁহার কন্যার যথার্থ সুখ বর্দ্ধিত হয়? আজ তিনি যাহাকে কন্যার সুখ বলিয়া মনে করিতেছেন, আজ কন্যার যে সুখের জন্য এতবড় মিথ্যা কথাটি এত অনায়াসে তিনি বলিয়া বসিলেন, সে যে সুখ মোটেই নয়, তাহাই যে তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। কি করিয়া সে ইহার প্রতিশোধ লইতে পারে, কেমন করিয়া সে জগতের সম্মুখে জানাইতে পারে যে পিতা হইয়া তিনি আজ কন্যার উপর কি অবিচার করিলেন! গীতা ঠিক করিল, যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে! করুক নির্ম্মাল্য তাহাকে গ্রহণ ও তারপর যত পারুক তাহাকে পেষণ করুক, সে কোন বাধা দিবে না। আকাঙ্ক্ষা ফিরিবার পর যখন

নির্ম্মাল্য তাহাকে পদদলিত করিবে, তখন ধ্বংসাবশেষ গীতা উঠিয়া আসিবে তাহার পিতার সম্মুখে, তাহাকে তাঁহার জ্বলন্ত কীর্ত্তির নিদর্শন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবে। তাহার জীবন বৃথা হউক ক্ষতি নাই, তবুও তাহার পিতাকে বুঝাইতে হইবে যে ধনের দিকে নজর দিয়া তিনি তাঁহার কন্যার উপর যে অত্যাচার আজ করিলেন এমন ব্যবহার অন্ততঃ পিতার সাজে না। নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া সে পিতার বুকে শেল হানিয়া যাইবে, তাহা হইলেই উপযুক্ত প্রতিশোধ হইবে।

পরদিন ভোরে যখন গীতা ঘর হইতে বাহির হইল তখন সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তাহার পিতা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন ; এখন যখন কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে তখন তাহা ফিরাইয়া লইলে লোকসমাজে তাহাদের মাথা কাটা যাইবে ও সেজন্য আজীবন অনুতাপ করিতে হইবে ইত্যাদি। তবে যদি কন্যা একান্তই নির্ম্মাল্যকে বিবাহ করিতে না চায়, তবে বাধ্য হইয়া তাহার কথা নির্ম্মাল্যকে বলিতে হইবে ; কিন্তু তাহাতে যে কত বড় দাগা আসিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিবে, তাহা কি গীতার অজানিত ?

গীতা বিশেষ কিছু উত্তর করিল না, কেবল একবার "বিবাহে আমার আপত্তি নাই" বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

কথাটা কুশলের কানে গিয়াছিল ; সে যখন শুনিল যে উভয় পক্ষের মতানুসারে গীতা ও নির্ম্মাল্যের বিবাহ আগামী মাসের প্রথম ভাগে সম্পন্ন হইবে, তখন সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল গীতার কাছে, ঐ জনশ্রুতির সত্যতা নির্ণয় করিতে। গীতার সহিত কুশলের সাক্ষাৎ হইল ছাদে ; তখন গীতা সেখানে রেলিং ধরিয়া একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকাইয়া ছিল। কুশল তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে গীতা তাহার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিল ; কুশল লক্ষ্য করিল মাধুর্য্য সে হাসির মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই, এ যেন একেবারে প্রাণহীন।

কুশল—সত্যি করে বল গীতা, আমি মনের উদ্বেগ আর চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার নিজের মুখ থেকে শুন্‌তে এসেছি যে কথাটা মিথ্যা।

গীতা—কথাটা সত্যি।

কুশল—সত্যি। তবে তুমি আমাকে ভাল বাস না? তুমি নির্ম্মাল্যকে ভাল বাস?

গীতা—না, আমি তোমাকেই ভাল বাসি।

কুশল—তবে—তবে—তোমার এ আচরণের অর্থ কি? ঠাট্টা রাখ, যোড়হাত করে তোমাকে মিনতি জানাচ্ছি, আমাকে আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের মাঝে ফেলে রেখ না, আমাকে সত্যি কথা বল।

গীতা—নির্ম্মাল্যকে আমি ভালবাসি না, তবুও আমি তাকেই বিবাহ করব, তার কারণ আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করে পৃথিবীর উপর বিশেষতঃ আমার পিতার উপর প্রতিশোধ নিতে চাই।

কুশল—আর আমার উপায়? আমাকে তুমি কি বলে চাবে!

গীতা—তোমাকে আগে আমি যেমনি ভাল বাসতাম চিরদিন তেমনিই ভাল বাস্‌ব। লোকের চক্ষে নির্ম্মাল্যের স্ত্রী হয়ে আমি তার ঘরে ঢুক্‌ব বটে, কিন্তু মনে মনে আমি তাকে কখনও স্বামী বলে গ্রহণ কর্‌তে পারব না, আমার ভালবাসার একবিন্দু সে পাবে না, এ ত আমার আত্মদান নয়, এ আমার আত্মোৎসর্গ।

৬

বিবাহের দিন কুশল আসিয়া গীতাকে বলিল "না গীতা, আমি অনেক ভেবেছি, কিছুতেই আমি এ বিবাহ হ'তে দিতে পারি না। নির্ব্বিবাদে আমাদের উপর এতবড় অত্যাচারটা হ'বে, তা আমরা কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না। মানুষ আমরা, আমাদের অভাব কিসের, পৃথিবীজোড়া আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আমাদের ক্ষমতা আছে।"

মৃদু হাসিয়া গীতা জিজ্ঞাসা করিল "কি করতে চাও ?"

"চল আমরা দুজনে পালিয়ে যাই।"

"ভয়ে পালাতে চাও ?"

"তা না হলে যে তারা তোমার উপর এতবড় অত্যাচারটা করে বস্‌বে। এখন পালিয়ে যাব, আবার দুদিন পরে ফিরে আস্‌ব।"

"না।"

"তবে এখানে বসেও ত তুমি বিবাহে আপত্তি করতে পার, তুমি বেঁকে বস্‌লে কার সাধ্য বিবাহ দেয়।"

"না, তা হবে না। আমি এ বিবাহ কর্‌বই।"

"গীতা, আমার ভালবাসার কি এই প্রতিদান ? তুমি আত্মোৎসর্গ করতে যাচ্ছ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে আমাকেও মেরে রেখে যাচ্ছ সে কথাটা কি একবারও ভাব্‌ছ না।"

গীতা হাসিল, ধীরে ধীরে কুশলের হাতখানা নিজের হাতের ভিতর লইয়া সে বলিল "দেখ কুশল, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস, এই কি যথেষ্ট নয় ? প্রেমিকের কাছে এর চেয়ে বেশী প্রয়োজনই বা কি ? আমি ত চিরদিনই ভেবে রেখেছিলাম যে তোমাকে ভালবাস্‌ব, কিন্তু কখনও বিবাহ কর্‌ব না। বিবাহ করা

সে একটা একঘেঁয়ে ব্যাপার, সৃষ্টির আদি হতে তা চলে আস্‌ছে। ভালবেসে বিয়েই যদি কর্‌লাম, তবে আমাদের প্রেমের মধ্যে বিশেষত্ব হল কি! দুজন দুজনকে ভালবাস্‌ব, কেউ কাউকে পাব না, পাবার আকাঙ্ক্ষাটা চিরদিন আমাদের ভালবাসাটাকে সজীব করে রাখ্‌বে, এই ত হল আমাদের অসাধারণত্ব। দৈবদুর্ব্বিপাকে আমাকে নির্ম্মাল্যের ঘরে ঢুক্‌তে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে বিবাহ আমি কখনও মনে প্রাণে স্বীকার কর্‌তে পার্‌ব না। তোমার আমার সম্পর্ক একই থাক্‌বে, কেবল একজন আমার দেহের অধিকার পাবে মাত্র। দেহ দানে আমি আমার পিতার উপর তাঁর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাই!"

গীতার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাহির হইতে তাহার পিতার আহ্বান শোনা গেল, তিনি বলিলেন "গীতা, তোকে একবার এদিকে আস্‌তে হবে"। গীতা কুশলের হাত ছাড়িয়া দিল, গীতার পিতা তখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহাকে সে অবস্থায় ঘরে আসিতে দেখিয়া কুশলের হাড় জ্বলিয়া উঠিল, তাহার এক্ষুদ্র সুখটুকুও তাঁহার সহিল না। পিতা ঘরে আসিলে, গীতা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কুশলকে এ অবস্থায় ঘরে দেখিয়া তিনি মনে মনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইলেন, গীতার বিবাহ হইতে চলিল তবুও এ আপদ

বাড়ী ছাড়িয়া নামে না কেন? কুশলকে বিশেষভাবে অপমানিত করিতেই তিনি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া চেয়ার টানিয়া টেবিলের কাছে বসিলেন; সম্মুখ হইতে একখানা সংবাদপত্র লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। কুশলও রক্ষা পাইল। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে হইলে হয় ত সে মনের বিরক্তি চাপিয়া রাখিতে পারিত না, হয় ত অসংযতভাবে তাঁহার প্রতি কটু ভাষাও সে প্রয়োগ করিয়া ফেলিত, তাহার মনের অবস্থা তখন এমন হইয়াছিল। তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া সে মনে মনে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ধীরে ধীরে সে ঘর পরিত্যাগ করিল। সেদিন যখন সে বাড়ী পৌছিল, তখন তাহার মনে হইতেছিল যেন সে আপন হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়িয়া গীতার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে আছে শুধু খোলসটা, হৃদয় বলিয়া যা কিছু সব আজ গীতার উদ্দেশে হাহাকার করিতেছে।

রাত্রিতে গীতার বিবাহ। ধর্ম্মযাজক গীতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "তুমি নির্ম্মাল্যকে পতিরূপে বরণ করিতে সম্মত আছ?" কি একটা উত্তর অস্পষ্ট ভাবে গীতার মুখ হইতে বাহির হইল, তাহা বোঝা গেল না, সবাই মনে করিল যে গীতা বলিতেছে "আছি"। গীতাও তাহাই

বলিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ হইয়া আজ যাহা অস্বীকার করিতে জাগ্রত হইয়াছিল, মুখে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া সে তাহার স্বীকারোক্তি বাহির করিতে প্রয়াস করিতেছিল, কিন্তু স্পষ্টভাবে সে কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিল না। ক্ষতি তাহাতে কিছুই হয় নাই, যথাবিহিত নিয়মে তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আনন্দে কাহারও লক্ষ্য আসে নাই যে বিবাহ-আসরে গীতার মুখ মরা'র মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। এ যেন তাহার বিবাহ-উৎসব নয়, এ যেন মৃত্যুর আগমনী-বাদ্য। নির্ম্মাল্য গীতার হাত ধরিয়া বসিয়াছিল; সে অনুভব করিতেছিল যে গীতা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। বিবাহ শেষ হইলে গীতাকে এক কোণে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া নির্ম্মাল্য জিজ্ঞাসা করিল, সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিতেছে কি না, তাহার মনে হইতেছে যেন তাহার শরীর তেমন ভাল নাই। গীতা মুখ তুলিয়া নির্ম্মাল্যের মুখের দিকে তাকাইল। নির্ম্মাল্য দেখিল যে তাহার চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, মুখ হইতে তাহার সমস্ত আভা মিলাইয়া গিয়াছে। নির্ম্মাল্য তাহাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইল ও তাহার উত্তপ্ত গণ্ডে এই প্রথম চুম্বন

করিল। গীতার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণপণ শক্তিতে সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে নিজের দেহটাকে নির্ব্বিশেষে নির্ম্মাল্যের হাতে বিকাইয়া দিয়াছে, এ দেহ লইয়া সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, তাহাতে বাধা প্রদান করিবার তাহার কোন অধিকার নাই।

নির্ম্মাল্য ভুল বুঝিল; সে মনে করিল যে গীতার শরীরটা যথার্থই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে; তবে এ আনন্দ উৎসবে সবার উত্তেজনার পথে বাধা দিতে সে চায় না, তাই নিজের শরীরে অবস্থা সে গোপন করিয়া আসিয়াছে। গীতাকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া নির্ম্মাল্য বাহিরে গেল। যাইবার সময় সবাইকে বলিয়া গেল যেন তাহাকে নির্ব্বিবাদে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয়, গোলমাল করিয়া যেন তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত না করা হয়। গীতাকে সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে বলিল ও বাহিরের সমাগত নিমন্ত্রিতদের নিকট হইতে যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় লইয়া সে এখনিই ফিরিয়া আসিতেছে, সে আশ্বাস দিয়া গেল। যাইবার সময় আবার তাহার ওষ্ঠে প্রগাঢ় চুম্বন দিয়া তাহাকে আর একবারের জন্য জ্বালাইয়া সে বাহিরে গেল।

নির্ম্মাল্য ঘর ছাড়িয়া যাইবার পর গীতার প্রথম চিন্তা হইল যে আজ হইতে ত ইহা নিত্যকার স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে ত আর এম্‌নি ভাবে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। নিজের মনের ভাব সে নির্ম্মাল্যকে কখনও জানিতে দিবে না, জানিতে দিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কি? নির্ম্মাল্যকে দেখাইতে হইবে যে সে পতি-প্রাণা নারী। এমন পতিপ্রাণা নারীকে নির্ম্মাল্য পরিশেষে কি প্রকার অবহেলা করে, তাহা পিতার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্যই ত সে প্রথম জীবনে এত বড় একটা উৎসর্গের অধ্যায় টানিয়া আনিল। তাহার এ সমস্তই হাসিমুখে লইতে হইবে, তাহার ব্রত উদ্‌যাপনের এই প্রথম কাজ।

শুইয়া শুইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, নির্ম্মাল্য ক্ষণপরেই এখানে আসিয়া পড়িবে, তাহার সহিত আজ হইতে তাহার রাত্রিযাপন করিতে হইবে। ভাবিতে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। যাহার সহিত যে কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে তাহার মন প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, আজ তাহাকে এক শয্যাভাগী দেখিয়া সে কেমন করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিবে? এত বড় অভিশাপ সে কেমন করিয়া সহিয়া যাইবে? তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল

তখনই চুপিচুপি গৃহ ত্যাগ করিতে। কিন্তু কোথায় যাইবে সে? যে দিকে দুই চক্ষু যায়। রাস্তায় বিপদ আসিতে পারে; কিন্তু বিপদে তাহার ভয় কি! আজ যত বড় বিপদ তাহার অপেক্ষা করিয়া আছে, ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর বিপদ কি? বা আসিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া কি, এমনি ভাবে ভয়ে পলায়ন করা তাহার সঙ্গত হইবে? পলায়নই যদি শেষে করিতে হইল তবে কুশলের মনে অত বড় দাগা দেওয়ারই বা তাহার কি প্রয়োজন ছিল, আর এত অনুষ্ঠানেরই বা কি দরকার পড়িয়াছিল? সে ত বহু পূর্ব্বেই কুশলকে লইয়া পলায়ন করিতে পারিত। না, সে পলাইবে না; সাহস করিয়া যে জিনিসটা সে টানিয়া আনিয়াছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত সহিবার সামর্থ্য তাহার সংগ্রহ করিতেই হইবে, ভীরুর মত পলাইতে সে কখনও পারিবে না। প্রথম হইতে যে জিনিষটার ভয়ে সে ভীত হয় নাই, তাহার সহিত চিরদিনই নির্ভয়ের সহিত তাহার যুঝিতে হইবে, নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার ভয়ে বিকল হইলে চলিবে না। ভাবিতে ভাবিতে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চিন্তা তাহার মাথা জুড়িয়া বসিল।

ভাবিতে ভাবিতে এক সময় অজানিত ভাবে সে ঘুমাইয়া পড়িল। নির্ম্মাল্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিল গীতা ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে অতি ধীরে, সে গীতার পার্শ্বে শুইয়া পড়িল, ও পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। গীতা কিছুই জানিতে পারিল না। ভোর হইতে না হইতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল।

ঘুম ভাঙ্গিতেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার মাথার নীচে বালিস নাই, নির্ম্মাল্যের বাঁ হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে ও নির্ম্মাল্য আর এক হাত দিয়া তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

৭

বিবাহের কয়েকদিন পরে নির্ম্মাল্যের বাড়ীতে একাকী বসিয়া সন্ধ্যায় গীতা গাহিতেছিল—

"যদি জান্‌তেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কি জানি তার নাম।"

এ কয়দিন গীতার উপব দিয়া অনেক ঝাপটা বহিয়া গিয়াছে, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া অবশেষে সে হৃদয় বাঁধিয়াছে, জীবনের অভিশাপকে সে এখন মনের মধ্যে

থাপ থাওয়াইয়া লইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিয়াছে। একটা করুণ-কাহিনীর নায়িকা হইয়াই যেন সে জীবনপথে নামিয়াছে ; তাহার ভূমিকা সুচারুরূপে অভিনয় করিয়া যাওয়াই এখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গীতা গাহিতেছিল, তাহার মন গানের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। এখন হইতে জীবনজোড়া তাহার অভিনয় ; এমনি এক এক সময় তাহার স্বাভাবিকত্ব উপলব্ধি করিবার তাহার সুযোগ মিলিবে, যেমন আজ গানের ভিতর তাহার মিলিয়াছে। গীতা গাহিতে লাগিল—

"সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তা'রে ক্ষণে ক্ষণে
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে,
বাজে অবিশ্রাম ॥"

গান থামিয়া গেল, গীতা কতক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া আবার গাহিতে লাগিল—

"আমার এই পথ চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে
বসন্ত।"

—এমন সময় সুশীলকে লইয়া নির্ম্মাল্য ঘরে প্রবেশ করিল, গীতা হারমোনিয়াম ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সুশীল বলিয়া উঠিল "না না, তা হচ্ছে না বৌদি, বরঞ্চ আমরা বাইরে যাই, আপনি গানটা শেষ করুন, যদি আমাদের সাম্‌নে গান গাইতে আপনার আপত্তি থাকে।"

নির্ম্মাল্য— না না, আপত্তি থাক্‌বে কি? তুই বস্, উনি গান গাচ্ছেন।

সুশীল—তোকে ত কোন কথা বল্‌ছি না ষ্টুপিড্, তুই কেন মাঝে পড়ে চেঁচাচ্ছিস্, দুদিন হ'ল বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই বউয়ের spokesman হয়ে এসেছেন আর কি। তা, তোর বউ ত আর বোবা নন যে তাঁর হয়ে তোকে সব কথা বল্‌তে হবে। কেমন বৌদি?—তবে এখন এই অধমদের প্রতি আপনার আজ্ঞা? এখানেই বস্‌ব, না বাইরে গিয়ে দাঁড়াব।"

গীতা হাসিয়া বলিল "বসুন, আমি গাচ্ছি।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া, হাসিয়া নির্ম্মাল্যের পিঠ চাপড়াইয়া সুশীল বসিয়া পড়িল। গীতা আবার হারমোনিয়াম বাজাইয়া গাহিতে লাগিল—

"আমার এই পথ চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে
বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে
বাতাস বহে
সুমন্দ ॥
সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে র'ব একা।
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততক্ষণ রহি রহি
ভেসে আসে সুগন্ধ।
আমার এই পথ চাওয়াতেই
আনন্দ ॥"

গান শেষ হইতে না হইতেই সুশীল "Bravo, bravo !" করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। গীতা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেই হাত জোড় করিয়া সুশীল বলিতে লাগিল "গোস্তাকি মাপ হয় বৌদি, আমার চিরকালই স্বভাব যে ভদ্রতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারি না। নির্ম্মাল্যকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে আমার জন্য ওদের অনেক ভদ্র-মহলে মাথা নীচু করতে হয়েছে। একটা কিছু ভাল জিনিষ পেলেই আমি এতটা উৎফুল্ল হয়ে উঠি ও সে উৎফুল্লটা চেপে রাখবার ক্ষমতা আমার এতই কম যে, এর জন্য আমার বন্ধুদের অনেকের কাছেই খাটো হতে হয়েছে।"

নির্ম্মাল্য তাহার বক্তৃতার মাঝ-পথে বাধা দিয়া বলিল "রাখ্ রাখ্, বাজে বকিস্ না, আলাপ করতে এসেছিস তাই কর, তোর কীর্ত্তির বড়াই এখন বরঞ্চ নাই করলি, পরে ত অনেক সময় পড়েই আছে।"

"বাঃ রে বাঃ এ কি করছি তবে। তোর অভিধানে কাকে আলাপ বলে জানি না। বৌদি, আপনিই বলুন না কেন, আমি যা করচি তাকে আপনি অন্ততঃ আলাপ নামে অভিহিত করতে পারেন কি না?"

মৃদু হাসিয়া গীতা ঘাড় নোয়াইল, সুশীল লাফাইয়া উঠিল "দেখেছিস্ গাধা, বৌদি কি বলেন? তোর কাণ্ডজ্ঞান মোটেই নেই, কাকে আলাপ বলে, কাকে কি বলে, সেটুকু বুঝবারও ক্ষমতা তোর নাই। যাক্। তবু ভাগ্যি এমন রত্ন তোর ভাগ্যে জুটেছে, বৌদি-ই তোকে মানুষ করে তুল্‌বেন" বলিয়া গীতার দিকে চাহিয়া সুশীল হাসিয়া উঠিল।

নির্ম্মাল্য বলিল "তুই যা বল্‌ছিস্ বৌদির দিক হতে, সে বিষয়ে certificate পেলেও আমি তাকে আলাপ বল্‌তে পারি না। কেবল নিজের কথাই অনর্গল বলে যাচ্ছিস্, যার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেছিস্ তাকে কি একটা কথা বল্‌বারও অবসর দিয়েছিস্!"

সুশীল লাফাইয়া উঠিল, দুই হাত যোড় করিয়া গীতার কাছে অভিনয়ের সুরে সে বলিতে লাগিল "সত্যিই বড্ড অপরাধ হয়ে গেছে; তা মহিমান্বিত বৌদি, আমার ত নিজের কোন গুণ নাই, আপনি আপনার নিজগুণে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। এখন বলুন আপনি আপনার কথা, আমরা উৎফুল্ল হয়ে সে অমৃতসুধা পান করি।"

গীতা তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইতে

লাগিল। সুশীলের রকম-সকম তাহার কাছে বড় ভাল লাগিয়াছিল; এমন মনখোলা ভাব চিরদিনই তাহাকে আকর্ষণ করিত। নানা কথাবার্ত্তায় সেদিন গীতা নিজেকে মাতাইয়া তুলিল। এমনি ভাবে আলাপ-সালাপে আনন্দ সে অনেক দিন পায় নাই। কথাবার্ত্তায় কখন সুশীল গীতাকে আপনি হইতে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সে নিজে টেঃ পায় নাই! গীতার কাছে এ 'তুমি' সম্বোধনটা বড়ই মধুর মনে হইয়াছিল।

কথায় কথায় সুশীল বলিল "বৌদি, তুমি গাইতেছিলে

সারাদিন আঁখি মেলে

দুয়ারে রব একা;

কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এক মুহূর্ত্তও একা থাক্‌তে এ বাঁদরটা দেবে না। এই ত সবে বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একেবারে ডুমুর ফুল হয়ে উঠেছে, দেখা পাওয়া ভার। অনেক বলে-কয়ে আজ একবার আমাদের বাড়ী নিয়েছিলাম, তাও ও না গেলে আমি আস্‌ব না বলে ভয় দেখিয়ে। একা ত থাক্‌বেই না, বরঞ্চ দোকা থাক্‌তে থাক্‌তে শেষে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌বে, তা আমি এখন থেকেই বলে দিলাম।" গীতা মনের মাঝে গভীর বেদনা অনুভব করিল; সুশীল ত জানে না যে তাহার প্রকৃত

অবস্থা কি? সে যে নবীন প্রেমের স্বপ্নর মধ্যে ডুবিয়া থাকার পরিবর্ত্তে দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, এ কথা কেই বা জানে!

"অভিনয়ের দিন তোমাকে ও নির্ম্মাল্যটাকে পাশাপাশি দেখে এমন একটা কথা আমার মনে হয়েছিল, আমার মনে আশা হচ্ছিল যদি সেই অভিনয়-জগতের অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা বাস্তব জগতের অর্জ্জুন ও চিত্রঙ্গদা হ'ত। আশা পূর্ণ হয়েছে, অন্তরের শুভেচ্ছা নিবেদন কর্‌তে আজ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুশীল রায় এখানে উপস্থিত। ক্ষত্রিয়জনোচিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর্‌তে এসেছি, ব্রহ্মজ্ঞানী বলে তা উপেক্ষা করতে পাবে না" বলিয়াই এক লাফে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সে লাঠিটা মাথার চারিদিকে ঘুরাইল, ও পরমুহূর্ত্তে হাসিতে সমস্ত ঘরটা আমোদিত করিয়া তুলিল। নির্ম্মাল্যও হাসিল, কিন্তু গীতা সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না, তাহার অন্তরটা তখন কিসের ব্যথায় দুলিয়া উঠিয়াছিল। হায়! সেই অভিনয়ই ত তাহার জীবনে সব চেয়ে বড় অভিশাপ। সে যদি অভিনয়ে যোগ না দিত, তবে আজ তাহার এ অবস্থা হইত না। গীতাকে হাসিতে যোগ না দিতে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল "না জেনে অপরাধ করে থাকি ত

ক্ষমা করো বৌদি, ক্ষত্রিয়ের আজকাল কিই বা আছে, লোকে কায়স্থ বলে অবহেলা করে, কিন্তু এ লাঠি-গাছটা থাক্‌তে কেনই বা সে অপবাদ নীরবে সহ্য করি। অসির পরিবর্ত্তে এই এখন আমাদের অস্ত্র।"

গীতা হাসিয়া উঠিল, সুশীল তেমনি ভাবে বলিতে লাগিল "দেখ্‌লে ত বৌদি, কলিযুগে ক্ষত্রিয়ের প্রভাব! কি অসাধ্য কাজ সাধন কর্‌লাম, তোমাকে হাসিয়ে দিলাম; পারে এ অধম ব্রহ্মজ্ঞানী নির্ম্মাল্যটা তা কর্‌তে।"

সেদিন সুশীল যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ গীতা সমস্ত ভুলিয়া তাহার সঙ্গে আলাপে মত্ত হইয়া রহিল। সুশীলের ব্যবহারে সে যথার্থই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেদিন সুশীল যাইবার সময় তাহাকে প্রতিদিন এক একবার আসিয়া দেখা দিতে গীতা অনুরোধ করিল।

সুশীল বলিল "এতই যদি রোজ রোজ বিরক্ত হবার তোমার সাধ হয়ে থাকে, তবে বেশ, তোমার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। তবে আমার ভয় হয়, কবে বিরক্ত হয়ে আবার তুমি আমাকে লাঠি-পেটা কর, শেষে তোমার হাতে এ ক্ষত্রিয়ের পিঠটা ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে যায়।"

সুশীল যাইবার পরে থাকিয়া থাকিয়া তাহার কথাই

গীতার মনে হইতে লাগিল , এমন বন্ধু লাভ করিয়া সে যথার্থই আনন্দ লাভ করিয়াছে। এমন বন্ধু লাভের জন্য সে স্বামীর নিকট যথার্থই কৃতজ্ঞ।

৮

বাহির হইতে জিনিষটা যে রঙ্গে দেখা যায়, ভিতরে ঢুকিয়া বোঝা যায় তা সম্পূর্ণ সেই প্রকার নহে ; কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে এইখানেই প্রভেদ। নির্ম্মাল্যের গৃহে গীতা তাহার জীবনের কথা যেমন কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, বাস্তবে হইল তাহা হইতে বিভিন্ন আনন্দ চিরদিনই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, গভীর বিষাদ ছাড়া আশ্রয় লইবার তাহার আর কিছুই নাই, ইহাই ছিল গীতার মনোভাব ; কিন্তু সে দেখিল যে মাঝে মাঝে আনন্দ করিবার এ গৃহেও তাহার কিছু কিছু আছে, এমন অবস্থায়ও অলক্ষিতে আনন্দ আসিয়া তাহার মনের মধ্যেও প্রবেশ করে, সে কথা অস্বীকার করিবার নহে। নির্ম্মাল্যের বিষয় সে যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিল, এখন তাহার সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া সে বুঝিল যে তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। ভোগই তাহার জীবনের একমাত্র

লক্ষ্য নয়, গীতার সহিত তাহার সম্পর্ক একমাত্র স্পৃহার নয়; এ দিক ছাড়া অন্য দিকেও তাহার দৃষ্টি ছিল, সে কথা গীতাও অস্বীকার করিতে পারে না। যদিও গীতা অনেকবার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সে নির্ম্মাল্যের সহিত কোন সম্পর্কই মনে প্রাণে স্বীকার করিবে না, ও তাহার সেই ইচ্ছা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করিত, তবু ত এ কথা আজ তাহার বলা চলে না যে তাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। স্বামীরূপে নির্ম্মাল্যকে গীতা দেখিতে পারে নাই বটে, তেমন প্রগাঢ় ভালবাসার বিন্দুমাত্রও তাহার হৃদয়ে নির্ম্মাল্যের জন্য সঞ্চিত হয় নাই; কিন্তু তাহাকে কি নিতান্ত পরের মত সে ভাবিতে পারিয়াছে? তাহার কি নির্ম্মাল্যের উপর বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ জন্মে নাই? এতদিনের সহবাসেও কি তাহার অন্তরে একটু না একটু দাগ কাটিয়া যায় নাই? আজকাল ত নির্ম্মাল্যের চুম্বন তাহার গায়ে তেমতি করিয়া ছুরির ঘা মারে না; আজকাল ত তাহার স্পর্শ তাহার কাছে বৃশ্চিকদংশনের মত মনে হয় না। এ সব সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি? না দিনে দিনে এ সবের উপর বিতৃষ্ণা তাহার কমিয়া আসিয়াছে বলিয়া? গীতা আজ কিছুতেই অস্বীকার

করিতে পারিতেছে না যে, নির্ম্মাল্যের স্পর্শ তাহার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই।

গীতার বিবাহের পরদিন হইতে কুশল কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে, এ যাবৎ তাহার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কুশলের অন্তর্দ্ধানে তাহার পিতা-মাতা এক প্রকার পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের একমাত্র আশা ভরসা এতদিনে শেষ হইল। এ ব্যাপারে গীতা নির্ম্মাল্যের উপর আরও চটিয়া গিয়াছিল; তাহার জন্যই আজ কুশলের ও তাহার নিঃস্ব পিতা-মাতার এ দুর্দ্দশা। গীতা মনে মনে স্থির করিয়াছিল, যদিও বা কোন দিন তাহার অন্তরের কোন কোণে নির্ম্মাল্যের জন্য এক আধ ফোটা করুণা জন্মিতে পারিত, কিন্তু এ ব্যাপারে তাহা চিরদিনের মত অসম্ভব হইয়া গেল. ইহা চিরদিনই তাহার অন্তরের দ্বারে দাঁড়াইয়া করুণার প্রতিবিন্দুকে তাহা হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। কিন্তু হইল অন্যরূপ, গীতা নির্ম্মাল্যের উপর গরম হইয়া উঠিল, তাহার অহরহ গৃহে উপস্থিতি এখন আর তাহার কাছে তত বিরক্তিকর মনে হইত না। একদিন নির্ম্মাল্য একটা কাজে সন্ধ্যায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিতে তাহার অনেক রাত্রি হইয়াছিল। তাহার ফিরিতে রাত হইতে দেখিয়া

গীতার মন চিন্তায় ভরিয়া উঠিতেছিল, গীতা মনকে চোখ ঠারিয়া বুঝাইতে চাহিল যে, এমন চিন্তা পৃথিবীতে যে কোন লোকের জন্য যে কোন লোকের হইতে পারে; ইহাতে তাহার ও নির্ম্মাল্যের মধ্যে সম্পর্কের কিছু বিশেষত্ব বোঝায় না, ও ইহার মধ্যে ভালবাসার কোনই হাত নাই।

গীতার আর এক সম্পর্ক জন্মিয়াছিল সুশীলের সঙ্গে। বিবাহের পূর্ব্বে অনেক যুবকই তাহাদের বাড়ী যাতায়াত করিত, কিন্তু এমন হাস্যপ্রিয়, সুভাষী ত তাহাদের মধ্যে একটিও ছিল না। এমনি করিয়া একান্ত অপরিচিত এক-জনকে এত আপন করিয়া লইতে ত কাহাকেও সে দেখে নাই। প্রথম দিন হইতে গীতার মনে হইতে লাগিল সুশীল যেন তাহার কতদিনের পরিচিত। ক্রমে ক্রমে আলাপে আলাপে গীতা সুশীলের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, সে যতক্ষণ তাহার বাসায় থাকিত ততক্ষণ তাহার সময় বেশ আনন্দের মধ্য দিয়াই কাটিয়া যাইত। সুশীল একজন সাহিত্যিক; কবিতা ও গল্প সে অনেক লিখিয়াছে। তাহার সমস্ত লেখা নির্ম্মাল্যের কাছে ছিল, সেগুলি গীতা মহা উৎসাহে পড়িতে লাগিয়া গেল। সে সব পড়িতে গীতার বড়ই ভাল লাগিত, তাহার লেখার প্রতি ছন্দে মস্ত বড় একটা প্রাণের সাড়া গীতার বুকে আসিয়া বাজিত।

লেখে ত অনেকেই, কিন্তু এমনি করিয়া প্রাণ দিয়া বুকের রক্ত ঢালিয়া কজন লিখিতে পারে, আর কজনই বা তা চেষ্টা করে। সুশীল যাহা লিখিয়াছে সমস্তই মন প্রাণ ঢালিয়া! যাহার মন পাণ আছে, সে তাহা পড়িয়া মুগ্ধ না হইয়াই পারে না। গীতাও আজ তাহার লেখায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। একদিন সে কথায় কথায় সুশীলকে বলিয়াছিল "সত্যি কিন্তু সুশীল বাবু, আপনার লেখার মধ্যে যেমন একটা প্রাণের স্পর্শ আছে, তেমন আর কোন লেখায় বড দেখা যায় না।"

সুশীল লাফাইয়া উঠিল "তাই নাকি বৌদি, তবে আর কি? তবু আমার লেখার কদর এ পৃথিবীতে একজন বুঝে ফেলেছে। মনের খেয়ালে কতকগুলি লিখে ফেলেছি, ঘরের পয়সা বের করে তা ছাপিয়েছি, presents যা দিয়েছি তার তবু সদ্ব্যবহার হয়েছে, বাদ-বাকিগুলা আমার বাড়ীতেই পড়ে আছে। বাজারে তার একখানাও কাটে নাই, যদিও পোকাতে তা রাশিরাশি কেটে ছিন্ন করে ফেলেছে। মনটা দমে গিয়েছিল বৌদি, কিন্তু আজ তোমার কথায় তা দীপ্ত দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে, আবার ক্ষত্রিয়ের রক্ত আমার ধমনীতে বইতে আরম্ভ করেছে।"

গীতা হাসিল; সুশীল বাধা দিয়া বলিল "হাস্‌বার কথা

নয় বৌদি, হেসে আমার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে দিও না। হঠাৎ একদিন আমার মনে হল যে, এ কলিযুগে ক্ষত্রিয়ের অসির পরিবর্ত্তে মসী দিয়ে তাদের বীরত্ব-গৌরব ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে, তাই মসী নিয়ে নিজেকে মাতিয়ে তুল্‌তে লেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু লোকের অশ্রদ্ধায় আমার সমস্ত গুলিয়ে গিয়েছিল; ভেবেছিলাম ক্ষত্রিয়ের এটা line নয়। কিন্তু আজ তোমার কথায় ঠিক বুঝেছি যে আমিই ঠিক, আমার ধমনীতে যে ক্ষত্রিয় রক্ত বইছে, তার প্রয়োগ মসীর উপর দিয়েই কর্‌তে হবে। আজ তুমি আমাকে তা বুঝিয়ে দিলে বৌদি, তোমাকে প্রণাম করি"। বলিয়াই গীতার উদ্দেশ্যে সে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বসিল; গীতা হাসিয়া উঠিল, সুশীলও সে হাস্যে যোগদান করিল।

সুশীলার সঙ্গ তাহাকে এমনিভাবে প্রচুর আনন্দ দান করিতে লাগিল। প্রতিদিন একবার করিয়া সে আসিত, অনেকদিন দুবার করিয়াও সে আসিত ও কোন কোন দিন সে সমস্ত দিন গীতার বাসায় থাকিয়া যাইত। গীতা ক্রমে ক্রমে সুশীলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

৬
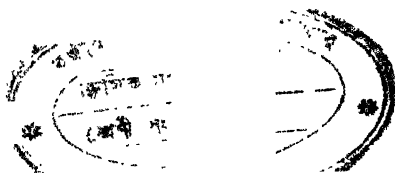
সুশীল ও গীতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছিল। সে ঘনিষ্ঠতা সামান্য বন্ধুত্ব হইতে কিছু দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। নির্ম্মালের চোখে কিছুই এড়ায় নাই; সে বুঝিয়াছে যে আজকাল তাহার বন্ধু ও স্ত্রীর মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক জমিয়া উঠিয়াছে যাহার মাঝে তাহার স্থান নাই। নির্ম্মাল্য মানুষ; এ অবস্থায় যাহা মানুষের ভাব হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল। বন্ধুর ও স্ত্রীর ব্যবহারে সে সন্দিগ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের মাঝে কোন প্রকার অপ্রীতি সৃষ্টি করিবার সে প্রয়াস পাইল না। তাই যদি হয়, সে যদি তাহার স্ত্রীর ও বন্ধুর প্রেমের এতই অযোগ্য হইয়া থাকে, যে তাহারা এমন ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই তাহাকে দিতে পারিল না, তবে তাহাই হউক, তাহারা যাহা ইচ্ছা করুক, সে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিবে না। কিন্তু দুঃখের উপর ত কাহারও হাত নাই, তাহার গতিরোধ করে এমন সাধ্যই কাহার? দুঃখ তাহার বুক ছাপাইয়া উঠিল। এ দুঃখে সে কাহাকেও ভাগী করিল না, নিজেই সে এ বোঝা বহিয়া চলিল!

কয়েকদিন যাবত নির্ম্মাল্যের লক্ষ্যে আসিয়াছিল যে, গীতা ও সুশীল একত্র হইলে তাহাদের মাঝে তাহার উপস্থিতি তাহাদের সহজ স্বাভাবিক আলাপে বাধা প্রদান করে। কারণ ইহার কিছুই নাই; কিন্তু ইহা হয়, এ কথা অস্বীকার করিবার নয়। সাধারণ একটা কথা লইয়া গীতা ও সুশীল মাতিয়া উঠিয়াছে; এমনি সময় যদি নির্ম্মাল্য আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের উৎসাহ মধ্যপথে বাধা পাইয়া জমিয়া যায়। নির্ম্মাল্য অপ্রস্তুত হইয়া যায়; এ কথা সে কথা বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে; কোনমতে দু চারটা কথা সারিয়া সে তাহাদিগকে একাকী ছাড়িয়া আসে। সুশীল ও গীতা আজকাল প্রায়ই বায়স্কোপে যায়; যাওয়ার সময় যদিও তাহারা একবার নির্ম্মাল্যের অনুমতি লয় ও নির্ম্মাল্যকে যাইতে অনুরোধ করে, তবুও তাহাদের ভাবগতিকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা নির্ম্মাল্য যাইবে না বলিলেই সন্তুষ্ট হইবে; নির্ম্মাল্য সঙ্গে গেলে যেন তাহাদের সমস্ত আনন্দ পণ্ড হইবে। নির্ম্মাল্য তাহাদের পথে দাঁড়াইতে চায় না, সে তাহাদের যাইতে অনুমতি দেয় ও নিজের কাজের অছিলায় বাসায় থাকিয়া যায়।

কিন্তু তাহাদের এ ব্যবহার যে নির্ম্মাল্যের বুকে কত বড় শেল সম বাজে একথা ভাবিবারও তাহাদের সময় হয় না।

সুশীল গীতার উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল প্রথম হইতেই কি না, সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহার সহিত যতই সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল, সে বুঝিতে পারিল যে গীতার মনের মধ্যে কিসের একটা জমাট ব্যথা সঞ্চিত রহিয়াছে। গীতা ও নির্ম্মাল্যের সম্পর্ক তাহার কাছে ঠিক সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না। কি যেন একটা গলদ কোথায় রহিয়া গিয়াছে, ইহাই তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া সুশীল ঠিক করিল যে, নির্ম্মাল্য বোধ হয় গীতার উপর কিছু অবিচার করিতেছে। হায়! এমন রত্নের মূল্য সে বুঝিতে পারিল না! সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, কিন্তু এ সহানুভূতি যে কবে কোন ক্ষণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধরিয়া মনের ভিতরটা জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

গীতা নির্ম্মাল্যের ঘরে ঢুকিয়াছিল বিক্ষুব্ধ মন লইয়া। প্রথম হইতেই সে নির্ম্মাল্যকে অত্যন্ত খারাপ ভাবিয়া আসিয়াছে ও তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। নির্ম্মাল্য যাহা

কিছু করিত তাহার একটা কুঅর্থ বাহির করিতে সে প্রাণপণে লাগিয়া যাইত ; নির্ম্মাল্যের সহিত ব্যবহারে মধ্যে সে তাহার প্রতি অত্যাচার অবহেলা ও অপমানের চিহ্ন বাহির করিতে চাহিত। নির্ম্মাল্যের ভালবাসা আদর তাহার কাছে চাতুরীর বেশী কিছু মনে হইত না। যাহা কিছু সে করে সবই ভোগ ও লালসার জন্য, হৃদয়ের সম্পর্ক তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই। তাহার সুশীলের সঙ্গে বন্ধুত্বও নির্ম্মাল্য অন্যায় চক্ষে দেখিয়াছে। খারাপ মন লইয়া সে আর কিই বা ভাবিতে পারে! গীতা নির্ম্মাল্যের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু সে বুঝিতেও পারে নাই. নির্ম্মাল্য কি করিলে সে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে। বোধ হয় কিছুতেই নয়। তাহার উপর রাগিবে ইহাই সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তা সে যাহাই করুক না কেন। তাহার যে-কোন কাজেই চটিয়া যাওয়া গীতার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না। তাহার ও সুশীলের সম্বন্ধে নির্ম্মাল্যের মনের ভাব যাহা তাহার কার্য্যকলাপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গীতাকে তাহার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল।

সুশীল ছিল এখানে গীতার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়। নির্ম্মাল্যের বাড়ীর ভিতর সমস্তই তাহার বিরক্তি উৎপাদন

করিত, সবটাতেই তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিত, ও এখনকার অবস্থার সঙ্গে পূর্ব্বের অবস্থা তুলনা করিয়া বর্ত্তমানের উপর সে মর্ম্মে মর্ম্মে বিরক্ত হইয়া উঠিত। এ বাড়ীতে তাহার একমাত্র আনন্দের জিনিষ ছিল সুশীলের সঙ্গ। এই মুখর যুবক তাহার মনের অনেকটা জুড়িয়া বসিয়াছিল। ইহার সহিত সে রাতদিন আলাপে মত্ত হইয়া থাকিত। ইহার সহিত সে বায়স্কোপ, থিয়েটার, সার্কাস দেখিত। ইহার সহিত বাড়ীর মোটর লইয়া সে প্রতিদিন মাঠে হাওয়া খাইতে যাইত,—নির্ম্মাল্য সঙ্গে আসিত না, ভালই হইত। কিন্তু তাই বলিয়া এ ব্যবহারের জন্য গীতা তাহার উপর বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। নির্ম্মাল্যের না আসাটাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এ না আসাটার মধ্যেও নির্ম্মাল্যের মনের একটা কদর্য্য দিক বাহির হইয়া পড়ে। নির্ম্মাল্য যে তাহাদের জন্য প্রতিদিন বাড়ীর মোটর ছাড়িয়া দিত, তাহাদের সুখের জন্য তাঃাদিগকে নির্ব্বিবাদে ইচ্ছামত সকল কার্য্যে স্বাধীনতা দিত, এটা গীতার চোখে মোটেই পড়ে নাই। সুশীলের উপর গীতার স্নেহ এতই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, কুশলের কথাও তখনকার জন্য তাহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছিল।

১০

সেদিন গীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া কুশল ঠিক করিল, সে আর দেশে থাকিবে না। তাহার চোখের উপর গীতার বিবাহ অন্য এক পুরুষের সঙ্গে হইয়া যাইবে, ইহা তাহার সহ্যের বাহিরে। তাহার স্কলারসিপের যাহা কিছু জমিয়াছিল তাহা লইয়া সেই রাত্রেই সে উধাও হইয়া বাহির হইয়া পড়িল,—তাহার পিতামাতা কেহই জানিতে পারিল না, সে কোথায় পলাইয়াছে।

হাওড়ায় যাইয়া প্রয়াগের টিকিট কিনিয়া কুশল গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া কোন স্থানে যাওয়া সে স্থির করে নাই; হঠাৎ প্রয়াগের কথা মনে হওয়াতেই সে সেখানকার টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছিল। বাঙ্গলা হইতে তাহার পলাইতে হইবে, তা যে যায়গায়ই সে গিয়া পড়ুক না কেন। কোন যায়গা সম্বন্ধে বিশেষ স্পৃহা তাহার ছিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, এককোণে ঠেস্ দিয়া কুশল তাহার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

পরদিন সে প্রয়াগে পৌঁছিল ও সেখানে এক সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এখন সে কি করিবে, কোন দিক দিয়া জীবনের গতি চলিবে, তাহা সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই; এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতেও সে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নাই। বাঙ্গালা হইতে বাহির হইয়া পড়াই ছিল তাহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, অন্য কোন কথা ভাবিবার তাহার অবসর হয় নাই। কিন্তু অদৃষ্টের গতি যে অলক্ষিতে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

বিকালে কুশল বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। এখানকার লোকজন, পথ ঘাট, সবই তাহার অপরিজ্ঞাত। সরাই হইতে বাহির হইয়া তাই সে নির্দ্দিষ্ট কোন দিকের উদ্দেশে যাইতে পারে নাই; তাই সে রাস্তায় ইতস্ততঃ অন্যমনস্ক ভাবে বিচরণ করিতেছিল। তাহার মন জুড়িয়া ছিল গীতার কথায়,—কেমন করিয়া তাহার বক্ষ দলিয়া নির্ম্মাল্য এ হেন রত্ন ছিনাইয়া লইয়া গেল! গীতা বলিয়াছে, নির্ম্মাল্য তাহার কেহই নয়, আজীবন সে কুশলকে ভালবাসিবে। কিন্তু কুশল সে কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। এখন গীতার মনের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, কালের আবর্ত্তে তাহা সমস্ত ওলোট্-পালোট হইয়া যাইবে;

গীতা একদিন না একদিন নির্ম্মাল্যকে ভালবাসিবেই। তখন তাহার হৃদয়ের কোন কোণে কুশলের জন্য একবিন্দু স্থান হইবে কি না, তাহা কে জানে ?

হঠাৎ কুশলের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। একখানা মোটর হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। গাড়ীর আরোহী ষোড়শ বর্ষীয়া একটী বাঙ্গালী যুবতী। রূপ তাহার যাহাই হউক না কেন, পোষাকের পারিপাট্যে ও ধরণ ধারণের প্রভাবে তাহাকে বেশ সুন্দরী বলিয়াই মনে হয়। চোখে তাহার পিনস্ নেজ্ চশমা, হাতে ব্যাগ, একখানা সংবাদপত্র লইয়া সে পড়িতেছিল। গাড়ী থামিতেই সে মুখ তুলিয়া সোফারকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সোফার নামিল, ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল পেট্রোল ফুরাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়! মেয়েটি একটু ভড়্কাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তে সে সোফারকে তাহার জন্য একখানা ভাড়া গাড়ী আনিতে হুকুম দিল। সোফার গাড়ীর খোঁজে চলিয়া গেল, যুবতী একাকী মোটরে বসিয়া রহিল। স্থানটি নির্জ্জন, এমন স্থানে যুবতীর, বিশেষতঃ সুন্দরীর, একাকী বসিয়া থাকা তত নিরাপদ নহে; কিন্তু উপায় নাই, গাড়ী না ডাকিলে তাহাকে এই অবস্থায়ই

পড়িয়া থাকিতে হয়। সুতরাং সাহসের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া সে মোটরে বসিয়া রহিল।

সোফার অনেকক্ষণ যাবৎ চলিয়া গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া যুবতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় দুইজন মাতাল গোরা সেখান দিয়া টলিতে টলিতে যাইতেছিল। যুবতীকে গাড়ীতে একাকী দেখিয়া ইহাদের দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কুশল এতক্ষণ দূর হইতে সমস্ত দেখিতেছিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না,—দুই লাফে সেখানে উপস্থিত হইয়া, গোরাদের উপর বিপুল বেগে ঘুসি বর্ষণ করিতে লাগিল। শারীরিক শক্তির সঙ্গতি কুশলের খুবই ছিল,—ঘুসি খেলিতে সে ভাল রকমই শিখিয়াছিল। কাজেই তাহাদের সম্মুখে ইহারা বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না,—বিশেষতঃ ইহারা তখন তেমন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। কুশল তাহাদের প্রায় কাবু করিয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় সোফার গাড়ী লইয়া সেখানে উপস্থিত। তখন সোফার ও কুশল উভয়ে মিলিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া গোরাদের বিদায় করিয়া দিল। গোরারা পলাইলে, সোফার কুশলকে তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কুশল বলিল, সে একজন মুসাফির, আজ মাত্র

এখানে আসিয়াছে। সোফার তাহাদের পরিচয় দিল। এখানকার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী সে কাজ করে,—যুবতী তাঁহারই একমাত্র কন্যা। সোফার কুশলকে তাহাদের সঙ্গে বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিল,—সাহেব নিজে তাহাকে ধন্যবাদ না দিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। তিনি যদি শোনেন যে এমন উপকারী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল না, তবে নিশ্চয়ই তিনি মনে মনে বড় দুঃখিত হইবেন, এবং তাহাকে তাঁহার কাছে লইয়া না যাওয়ার জন্য তাহার উপর রাগ করিবেন।

কুশল মৃদু আপত্তি তুলিল, কিন্তু মিস্ ব্যানার্জ্জি যখন তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাকে আস্‌তেই হবে", তখন আর সে কোন আপত্তি করিতে পারিল না। এ যেন কোন অকাট্য আজ্ঞা, ইহা মাথায় তুলিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

মিষ্টার ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কুশলকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কন্যা মৈত্রেয়ীর মুখে সমস্ত শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি কুশলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সে আজ এই পরিবারের যে উপকার করিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে দিবার কিছুই নাই। কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের বুক ছাপাইয়া উঠিয়াছে, ভাষার শক্তি নাই তাহা প্রকাশ করে। আজ সে-ই তাঁহাদের পরিবারের মান, সুখ, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের প্রাণাধিক কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া সে আজ তাঁহাদিগকে এ দৈব দুর্ব্বিপাকের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে,—তাহাকে দিবার উপযুক্ত ত কিছুই নাই।

তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া কুশল পরিতৃপ্ত হইল, এবং তাঁহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে কুশল উঠিয়া বিদায় লইতে গেলে, মিষ্টার ব্যানার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন "সে কি কথা, তুমি আজ আর কোথায় যাবে! একে ত এদেশে বাঙ্গালী পাওয়াই ভার,—কাউকে পেলে আর

ছাড়্তে ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া, তুমি ত শুধু স্বদেশবাসী নও,—তুমি যে আমাদের পরম আত্মীয়। আত্মীয়েরাও বোধ হয় এত উপকার কর্‌তে পারে না। আজ এক দিনে আমরা তোমার সঙ্গে যে হৃদয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি, এ সম্বন্ধ ছিন্ন কর্‌বার শক্তি আমাদের ত নাই-ই,—তোমারও বোধ হয় নাই।"

কুশল তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না,—সে রাত্রিতে সে ব্যানার্জ্জির ভবনেই থাকিয়া গেল। পরদিনও তাহার সরাইয়ে যাওয়া হইল না,—মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাহাকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া বসিয়াছেন। এমনি ভাবে দু' তিন দিন কাটিয়া গেলে, কুশল সরাইয়ে যাইতে চাহিল,—সরাই-ওয়ালারা হয় ত মনে করিয়াছে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জি বলিলেন "আর সরাইয়ে গিয়ে কি হবে? যে কয় দিন আছ, এখানেই থেকে যাও। মোটর নিয়ে বরঞ্চ সরাই থেকে তোমার জিনিষপত্র নিয়ে এস।"

কুশল ওজর আপত্তি তুলিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—মিষ্টার ব্যানার্জ্জি ছাড়িবার পাত্র নহেন। বিশেষতঃ, যখন মৈত্রেয়ী তাহার দিকে তাহার বিশাল দুই চক্ষু স্থাপন করিয়া পরম আগ্রহের সহিত বলিল, "আপত্তি না থাক্‌লে এখানে থেকে যান্ না কেন?" তখন আর তাহার

কোন আপত্তি টিকিল না, সরাইয়ে যাইয়া সে সমস্ত জিনিষ লইয়া আসিল।

কুশল ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে পরম আদরে রহিয়া গেল। মিষ্টার ব্যানার্জ্জি তাহার সকল পরিচয় লইয়াছিলেন। কুশল সমস্ত কথা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিয়াছিল; কেবল গীতারই কোন কথা সে উত্থাপন করে নাই। নিজের দুরবস্থা দেখিয়া, উপার্জ্জনের কোন উপায় নাই দেখিয়া, সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—বিদেশে যদি কোন উপায় হয়। দৈহিক শ্রম করিতে সে পিছপাও নয়,—কুলীগিরি করিতেও সে প্রস্তুত আছে। স্বদেশে এ সব করা তাহার চলিবে না; তাই সে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জি মৃদু হাসিলেন; বলিলেন "তোমার এই সবে যৌবনের প্রারম্ভ,—এখনই জীবনের এমন একটা pessimistic view নিলে চল্‌বে কেন।"

মৈত্রেয়ী ও কুশলের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া উঠিতেছিল। তাহারা দুইজনে মিলিয়া অনেক সময় বাগানে বেড়াইত, ফুল তুলিয়া তোড়া বানাইত, বাগান সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা করিত। মিষ্টার ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতেন,—কিসের একটা আনন্দের বার্ত্তা তাঁহাদের মন জুড়িয়া বসিত। একটা

ইচ্ছা প্রথম দিন হইতেই মিষ্টার ব্যানার্জ্জির মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল ; দিন দিন তাহাদের দেখিয়া এ ইচ্ছাটা তাঁহার মনের ভিতর দৃঢ় ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল।

এক দিন মিষ্টার ব্যানার্জ্জি কুশলকে ডাকিয়া বলিলেন "কুশল, তোমার আর বোধ হয় চুপ করে বসে থাকা উচিত হবে না।"

কুশল—"আমারও তাই মত। আমাকে যদি দয়া করে কোন একটা চাকরী যোগাড় করে দিতে পারেন, তবে আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌ব।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি হাসিলেন ; বলিলেন "আমি তা বল্‌তে চাই না। তোমার আবার পড়াশুনা আরম্ভ কর্‌তে হবে।"

"পড়াশুনা কর্‌বার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই, তা ত আপনার অজ্ঞাত নয়।"

"না, তুমি বিলাত যাও। সেখানে কেম্ব্রিজে পড় ও সিবিল সার্বিসের জন্য চেষ্টা কর।"

কুশল অবাক্‌,—ইনি বলেন কি! পরিহাস করিতেছেন না ত?

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "আমি সমস্ত ঠিক করে ফেলেছি। তোমার জন্য কেম্ব্রিজে সিট্‌ যোগাড় করা হয়েছে,

পাস্‌পোর্ট ও প্যাসেজ্‌ সবেরই আমি বন্দোবস্ত করেছি। এখন তোমার প্রস্তুত হওয়াই বাকী ”

কুশল এতক্ষণে সমস্ত বুঝিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিন্তু এ দান গ্রহণ করিতে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল “কিন্তু আপনার দান—”

মাঝ পথে বাধা দিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, “না, ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না। তুমি আমাদের যে উপকার করেছ, আমাদের সর্ব্বস্ব তোমাকে দিলেও তার উপযুক্ত প্রতিদান হয় না। আর আমি তোমাকে সামান্য অর্থ দিয়ে তোমার মহত্ত্বের অবমাননা করতে চাই না। ফুল ফোটাবার অধিকার সকলেরই আছে। জলাভাবে যদি ফুল নষ্ট হয়ে যায়, তবে যে কেউ এসে তাতে জল দিয়ে তাকে তাজা করে তুল্‌তে পারে। আমিও তাই চাই। তোমার মত যুবক যে সংসারের প্রথম ঝাপ্‌টাতে নিরাশ হয়ে পড়্‌বে, তা আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। তোমাকে মানুষ করে তুল্‌তে আমি সামান্য সাহায্য কর্‌তে চাই। এ আমার পরম তৃপ্তি। আশা করি, তুমি আমার এ সুখে বাধা প্রদান কর্‌বে না। আর তা ছাড়া, আর্থিক সাহায্য আমার কাছ থেকে নিতে যদি তোমার প্রধান আপত্তি

হয়ে থাকে, তবে বেশ, মানুষ হয়ে ফিরে এসে তুমি আমার সমস্ত টাকা সুদ সমেত ফিরিয়ে দিও।”

এ কথার উপর আর কথা চলে না। কুশল তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সমস্ত ঠেলিয়া আজ তাহার বুক ছাপাইয়া উঠিতেছিল মিঃ ব্যানার্জ্জির পিতার অধিক ভালবাসার পরিবর্ত্তে তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

১২

কুশলের বিলাত যাইবার দিন ব্যানার্জ্জির পরিবারের সকলেই আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় দমিয়া গিয়াছিল,—যুগপৎ সুখ ও দুঃখ তাঁহাদের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এত দিন তাহার সঙ্গে বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটান গিয়াছে। আজ সে তাঁহাদের ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছে,—আবার কবে দেখা হইবে, কে জানে? ব্যথায় তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। অন্যদিকে, সে নিজের উন্নতির জন্য বিদেশে যাইতেছে, এক দিন ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণ গৌরবে সে তাহার জীবন আরম্ভ করিবে,—এ চিন্তায় তাঁহাদের মন সুখে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কুশল আত্মীয় হিসাবে তাঁহাদের পারিবারিক বন্ধু মাত্র, কিন্তু পরম আত্মীয় হইতেও আপন।

আজ সে চলিয়া যাইতেছে,—সবারই মনে হইতেছে যেন বাড়ীর ছেলে ঘর দুয়ার খালি করিয়া যাইতেছে।

সকলে ষ্টেসনে আসিয়া কুশলকে ট্রেণে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দৃষ্টি যায় ততক্ষণ মৈত্রেয়ী কুশলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল,—বারেকের তরেও সে বিশাল চোখ দুটির পলক পড়িল না। কুশল দেখিল, তাহার গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার দৃষ্টিভরা শুভেচ্ছা যেন চেঁচাইয়া বলিতেছে,—সফল হও, সুখী হও, পূর্ণ গৌরবে আবার ফিরিয়া এস। সে দৃষ্টি কুশলের অন্তর আলোড়িত করিয়া দিল। সে দৃষ্টির মাঝে কি একমাত্র শুভেচ্ছাই জড়ান ছিল? এর বেশী কি আর কিছুই তার মাঝে ধরা পড়ে নাই? কুশলের হৃদয়ের মাঝেও কি সে দৃষ্টি আর কোন রকম তরঙ্গ তুলে নাই? তখনও গীতা কুশলের হৃদয়ের সমস্তটা জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার মাঝে মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব তাহার অন্তরের ভিতর মস্ত বড় একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া দিল।

এডেন হইতে কুশল পিতা, মাতা, ও মিষ্টার ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কাছে পত্র দিল। মৈত্রেয়ীর নামে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল। তাহা লিখিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কি বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিবে

তাহা লইয়াই প্রথম গোল বাধিল। অনেক চিন্তা করিয়া শেষে মৈত্রেয়ী বলিয়া সম্বোধন করাই ঠিক হইল। লিখিতে বসিয়া দেখা গেল, মহা ঝঞ্ঝাট ; কি লিখিবে তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে সে ষ্টীমার সমুদ্র ইত্যাদির কথায় চিঠি ভরিল। কিন্তু পরিশেষে চিঠি পাঠান হইল না.—লজ্জা আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া বসিল, সে চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

বিলাত পৌঁছিবার কিছু দিন পরেই কুশল মিষ্টার ব্যানার্জ্জির পত্র পাইল। তিনি তাঁহার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে গুটিকতক পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার চিঠির শেষভাগে লেখা ছিল, "মৈত্রেয়ীকে তুমি কোন চিঠি দেও নাই, সে তাতে দুঃখিত হয়েছে। আশা করি, তুমি তাকে চিঠি দিবে।"

সত্যিই ত! তাহার এটা ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে। লজ্জার বাঁধন কাটাইয়া সেই চিঠিই পাঠান তাহার উচিত ছিল। কুশল তখনি তাহাকে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথম পৃষ্ঠা তাহার চিঠি না দেওয়ার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেই ভরিয়া গেল। তার পর কি লিখিবে তাই লইয়া আবার গোল বাধিল। রাস্তার খবর, লণ্ডনে আসিয়া সে যাহা যাহা দেখিয়াছে সে সমস্তের বর্ণনা, এলাহাবাদের পুরানো

কতকগুলি কথা স্মরণ ইত্যাদি নানা কথায় সে তাহার চিঠি ভরিয়া দিল। তাহার চিঠি বেশ দীর্ঘ হইল। পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি লিখিয়া সে তখনই মৈত্রেয়ীকে পাঠাইয়া দিল।

গীতাকেও সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল; কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে চিঠি পাঠান হইল না। যাহাই হউক না কেন, লোককে সে এখন নির্ম্মাল্যের স্ত্রী, নির্ম্মাল্যের অনুমতি ভিন্ন তাহার সহিত মেলামেশা করা বা চিঠি লেখায় তাহার ন্যায়তঃ কোন অধিকার নাই; বিশেষতঃ, তাহাদের মধ্যে যখন একটা স্বতন্ত্র সম্বন্ধ আছে।

কিছু দিন পরেই সে কেম্ব্রিজে চলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সে পিতা মাতার পত্র পাইল। তাঁহারা অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া চিঠি দিয়াছেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহারা জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন,—সে-ই যে তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। যাক্ সে যখন আশ্চর্য্য উপায়ে বিলাতে গিয়া পড়িয়াছে, তখন আর সে সম্বন্ধে আনন্দ ছাড়া কিছুই করিবার নাই। সে যেন তাড়াতাড়ি পিতা মাতার কোলে ফিরিয়া আসে। তাঁহারা চিরদিন তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবেন। বেশী পড়াশুনা নাই বা হইল, তবুও সে যেন দূরদেশে বেশী দিন না থাকে,—যত শীঘ্র সম্ভব দেশে

ফিরিয়া আসে। আর বিদেশীদের সহিত সে যেন বেশী মেলামেশা না করে,—বাঙ্গালীর ছেলের তাদের সঙ্গে বেশী না মেশাই উচিত।

পিতার চিঠি পাইয়া কুশল হাসিল,—তাঁহারা তাহাকে এতদূর অপদার্থ মনে করেন! মিষ্টার ব্যানার্জ্জির অন্ততঃ তাহার চরিত্র সম্বন্ধে ইহা হইতে উচ্চ ধারণা আছে। স্নেহ-প্রবণ পিতা মাতার হৃদয়ে বোধ হয় চিরদিনই পুত্রের আত্ম-নির্ভরতা ও চরিত্র বলের সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা থাকে।

কয়েকদিন পরে মেয়েলি হাতের লেখা একখানা চিঠি কুশলের নামে আসিল। চিঠি পাওয়া মাত্র তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, এ কাহার পত্র। সে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন আজ একজনের চিঠি পাইয়া তাহার মনে এমন ভাবের আবেশ হইল। বন্ধুর চিঠি পাইলে কি বন্ধুর এমন ভাব হইয়া থাকে? মৈত্রেয়ী কি তাহার বন্ধু মাত্র? বন্ধুত্ব ছাড়া কি আর কোন সম্পর্কই তাহার সহিত সংস্থাপিত হয় নাই? তাও কি সম্ভব? কুশল যে মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল যে, গীতা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোককে যে ভালবাসিবে না!

একনিশ্বাসে সে মৈত্রেয়ীর চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল।

চিঠিখানার প্রতি ছত্রে যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ আছে। একবার পড়িয়া তাহার তৃষা মিটিল না,—সে বার বার চিঠিখানা পড়িতে লাগিল। যতবারই পড়িল, ততবারই তাহার ভিতর হইতে নব নব সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল। অজানিত ভাবে হঠাৎ এক সময়ে কুশল চিঠিখানা তাহার মুখের কাছে লইয়া তাহা চুম্বন করিয়া বসিল।

১৩

সেদিন গীতা বাপের বাড়ী হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, কুশল আই-সি-এস্ পাশ করিয়াছে ও বাঙ্গল দেশে চাকরী পাইয়াছে। এক বৎসর শিক্ষার পরে সে দেশে ফিরিবে,—এখনও তাহার কয়েকটা সামান্য পরীক্ষা বাকী আছে। কুশল যে কি উপায়ে বিলাত গিয়াছিল, তাহা গীতা অনেক দিন পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জির কথা সে জানিয়াছিল, কেবল জানিতে পারে নাই মৈত্রেয়ীর কথা। গীতা চিরদিনই আশা করিয়া আসিয়াছে যে, কুশল যে কোন স্থানে থাকুক্ না কেন, সে তাহাকে পত্র না দিয়া পারিবে না। প্রতিদিনই গীতা কুশলের পত্রের আশা করিত।

বিলাতী ডাক আসিবার দিন সে উন্মুখ হইয়া থাকিত, বোধ হয় আজ কুশলের চিঠি আসিবে. কিন্তু কুশলের চিঠি আসিল না। গীতা তাহাকে চিঠি দিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু অভিমান আসিয়া তাহাকে বাধা দিল। কুশল যদি তাহাকে চিঠি না দিয়া থাকিতে পারিল, তবে তাহারই বা এমন কি বিশেষ গরজ পড়িয়াছে যে, গায়ে পড়িয়া তাহাকে চিঠি দিতে হইবে রাগে গীতা কুশলকে কোন চিঠি দিল না।

সেদিন গীতার পিতা কুশলের কথা তুলিয়া বলিলেন, "আমি চিরকালই জান্‌তাম, কুশল ছোঁড়াটা চমৎকার। সে যে এক দিন একটা মস্ত বড় লোক হবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। গীতার সঙ্গে উহার মেলামেশা দেখে, আমি ওর হাতেই গীতাকে দিব মনে করেছিলাম। কিন্তু নির্ম্মাল্যও ত কম কিছুই নয়। সে যখন উপযাচক হয়ে গীতাকে প্রার্থনা করল্‌, তখন পিতা হয়ে ত আমি কন্যার এত বড় সুখের সুযোগটা ছেড়ে দিতে পারি না।"

গীতা পিতার কথা শুনিল। মনে মনে সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তবে পিতার এর মধ্যেই আপ্‌শোষ আরম্ভ হইয়াছে। মনের আপ্‌শোষ মুখের কথায় ঢাকিতে তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, প্রতি পদে

তাহা বাহির হইয়া পড়িতেছে। পিতার প্রতি গীতার ঘৃণা জন্মিল। অনায়াসে এত বড় একটা মিথ্যা কথা তিনি বলিয়া ফেলিলেন! কুশলকে নিঃস্ব জানিয়া তিনি তাহাকে অবহেলা ও ঘৃণা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আজ সে বড় চাকরী পাইয়াছে জানিয়া তিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিলেন যে, তাহার হাতেই কন্যা দিবেন বলিয়া তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন।

বাসায় ফিরিয়া আজ গীতা কেবল কুশলের সম্মানের কথাই ভাবিতেছিল। এতদিনের অদর্শনে কুশলের কথা তাহার হৃদয়ের ভিতর কতকটা চাপা পড়িয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার পূর্ণ গৌরবে আশু স্বদেশে আগমনের সংবাদে তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুশলের কথা ভাবিতে তাহার মন অভিমানে ভরিয়া উঠিল। এমন একটা কথাও তাহার অন্যের মুখে শুনিতে হইল! কুশল এক লাইন লিখিয়াও তাহাকে এ শুভ সংবাদটা দিতে পারিল না? কুশলের জন্য সে সমস্ত ছাড়িয়া বসিয়া আছে,—স্বামীকে সে একদিনের জন্যও স্নেহের চক্ষে দেখিয়া উঠিতে পারে নাই। পৃথিবীর সমস্ত আশা, ভরসা, সুখ, সম্পদ, সে কাহার জন্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে?—একমাত্র কুশলের জন্যই। আর সে? তাহার স্মৃতিপট হইতে হয় ত গীতার ছবি চির-

দিনের তরে মুছিয়া গিয়াছে,—হয় ত সে বিদেশী যুবতীর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছে,—হয় ত গীতার স্মৃতি আজ কাল তাহার হাস্য উদ্রেক করে মাত্র !

বাহিরের ঘরে বসিয়া গীতা এসব চিন্তায় ডুবিয়াছিল, এমন সময় সুশীল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলের আগমনে গীতার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সুশীল আসিয়াই বলিয়া উঠিল,—"সে কি বৌদি, একা একা গুম্ মেরে বড় যে এখানে বসে আছ, ব্যাপারখানা কি ?"

গীতা মৃদু হাসিল। সে হাসির মধ্যে কোন আবেগ ছিল না। সুশীলের চোখে তাহা পড়িল। সে বুঝিতে পারিল না, কি বিশেষ বেদনায় গীতা আজ আক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে যে, কি যেন একটা গোপন ব্যথা গীতার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, গীতা যেন বলি বলি করিয়া সে কথা তাহার কাছে বলিতে পারে নাই। সে কথা শুনিতে তাহার চিরদিনই কৌতূহল হইয়াছে ; কিন্তু কোনদিন সে কৌতূহল সে মুখে প্রকাশ করে নাই। সে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে যে, চিরদিনই গীতা তাহার কাছে একটা আত্মসমর্পণের ভাব লইয়া অগ্রসর হয়,—সে যেন তাহার পরম প্রীতিপ্রদ আশ্রয়। এতটা নির্ভরতা তাহার উপর যাহার, সে যে এক দিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার

মনের দুঃখ তাহার কাছে খুলিয়া বলিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তাহার মনে ছিল না। গীতার মনের ভিতর যে এত বড় একটা খাদ থাকিতে পারে, এ কথা সুশীল কল্পনাও করিতে পারে নাই।

গীতাকে সেদিন এ অবস্থায় দেখি। সুশীল বুঝিল যে, তাহার জমানো দুঃখ আজ তাহাকে বিশেষভাবে পীড়ন করিতেছে। দুঃখ হইতে মনটাকে অন্য দিকে আকর্ষণ করিতে পারিলে হয় ত গীতার চিত্ত কতকটা শান্ত হইতে পারিবে, এই আশায় সুশীল বায়স্কোপে যাইবার জন্য গীতাকে অনুরোধ করিল। সে বলিল "আজ Picture House এ Daughter of the goddess film আছে, চল দেখে আসি।"

গীতা তখনই সম্মত হইল ও মোটর তৈয়ারি করিতে বলিল। খবর আসিল, বাবু মোটর লইয়া কোথায় কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাহাদের ট্যাক্সিতে বায়স্কোপে যাইতে হইল।

বায়স্কোপ দেখিয়া বাহির হইয়া তাহারা একখানা ফিটন ভাড়া করিল ও বাড়ীর দিকে না যাইয়া ইডেন গার্ডেনের দিকে গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল। গাড়ী গার্ডেনে থামিল তাহারা নামিয়া পড়িল ও ঝিলের ধারে একখানা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। সেদিন পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসিতেছিল।

বসিয়া বসিয়া তাহারা চারিধারের সেই শোভা দেখিতে লাগিল। জল টলমল্ করিতেছিল; পূর্ণচন্দ্রের ছায়া জলের ভিতর ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছিল; চারিধারের গাছপালা চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করিতেছিল। দূর হ'তে হাস্নাহানার গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া চারিধার আমোদিত করিয়া দিতেছিল। ইহার ভিতর তাহারা বসিয়া রহিল,—কাহারও মুখে কথা নাই। কি যেন একটা কথা তাহাদের উভয়ের বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে, ভাষার শক্তি নাই যে তাহার মূর্ত্তি দান করে। অনেকক্ষণ পরে সুশীল আরম্ভ করিল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে অনেক দিন হতেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার হৃদয় মাঝে মস্ত বড় একটা কথা চাপা রয়েছে, যা তুমি একমাত্র তোমারই করে রাখ্‌তে চাও, -সাবধানে তুমি আর সবাইকে তা থেকে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে চাও। কি তোমার সে ব্যথা, আমাকে তা বল্‌তে কি তোমার আপত্তি আছে?"

গীতা কাঁদিয়া ফেলিল। সুশীল ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি নিজের হাতের মাঝে টানিয়া লইল। গীতার গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল। চাঁদের আলোতে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সুশীল রুমাল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিল "গীতা!"

এই প্রথম সে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। "আমি বুঝেছি যে, তোমার ও নির্ম্মাল্যের সম্পর্কটা তেমন সুখের হয় নাই। তুমি নির্ম্মাল'কে ভালবাস্‌তে পার নাই। তোমার ভালবাসাটা বোধ হয় আর কোন লোকের উপর গিয়ে পৌ'ছেছে।" গীতা কোন কথা বলিতে পারিল না,— সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। সুশীল গীতাকে ভুল বুঝিল। সে বলিল "গীতা, এতদিন জোর করে মনে চেপে রেখেছি; কিন্তু আজ না বলে থাক্‌তে পারছি না। আমার মনে অনেক দিন থেকেই সন্দেহ জন্মেছে যে, যে নিঃস্ব সেবক তোমার চরণে সমস্ত সমর্পণ করে বসে আছে, তোমার করুণা বোধ হয় তাতেই গিয়ে পৌছেছে।" গীতা চমকাইয়া উঠিল,— সুশীল বলে কি? হাত ছাড়াইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। সুশীল অপ্রস্তুত হইল। সে বুঝিল, সে ভুল করিয়াছে। গীতাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিতে লাগিল, "না বুঝে যদি অন্যায় করে থাকি, তবে তা ক্ষমা করো।"

"অন্যায় যদি কারো হয়ে থাকে, তবে সে আমার। তবে আপনার মস্ত বড় ভুল হয়েছে,—আমি স্বামীর বাড়ীতে বসে স্বামীর বন্ধুর প্রেমে উন্মত্ত হই নাই।" বলিয়াই দৃঢ় পদক্ষেপে গীতা সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

বাগান হইতে বাহির হইয়াই একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া

বাসা অভিমুখে যাইতে বলিয়া সে গাড়ীর ভিতর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল, তাহার আর কিছু ভাবিতেও ইচ্ছা যাইতেছিল না। আজ সুশীল তাহাকে এমনিভাবে অপমান করিল! সুশীলেরই বা দোষ কি! সে এতদিন যে আচরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে ওরূপ কথা মনে করা ত কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সুশীল মানুষ, সে মানুষের মতই ভাবিয়াছে। এজন্য যদি কেহ দোষী হইয়া থাকে, তবে সে নিজে,—সে ছাড়া আর কাহাকেও ত এর জন্য দায়ী করা যায় না। চিরদিন সে ভাবিয়া আসিয়াছে যে, বিবাহের পরে নির্ম্মাল্য তাহাকে অপমান করিবে। কিন্তু নির্ম্মাল্য ত বস্তুতঃ একদিনের তরেও তাহাকে অপমান করে নাই। সে নিজেই নিজের অপমানের মূল হইয়াছে।

বাসায় আসিয়াই সে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল,—পড়িতে পড়িতে সে সাম্‌লাইয়া গেল। নির্ম্মাল্যের মোটর একটা লরীর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নির্ম্মাল্য ভয়ানক জখম হইযাছে। তাহাকে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া যাওয়া হইয়াছে,—জীবনের আশা বড় নাই। দ্বিতীয় কথা চিন্তা করিবার আগেই সে আবার ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল ও সোফারকে মেডিক্যাল কলেজে যাইতে আদেশ করিল।

গীতার সমস্ত ওলোট্ পালোট্ হইয়া গেল। এই কি সেই গীতা, যে এত দিন মনে-প্রাণে নির্ম্মাল্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে? এই কি সেই গীতা, যে এক দিন সদম্ভে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, নির্ম্মাল্যের সুখে দুঃখে তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না? সে যখন তাহার কেহই নয়, তখন তাহার সুখ কিংবা দুঃখে তাহার কি যায় আসে! কৈ, সে গীতাকে ত এর মধ্যে দেখা যায় না,—যে নির্ম্মাল্যের প্রত্যেক ব্যবহারের কু-অর্থ বাহির করিতে লাগিয়া যাইত,—তাহার কোন দিকটাই যাহার কাছে সরল স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত না! সত্যি যদি নির্ম্মাল্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ সংস্থাপিত নাই হইয়া থাকে, তবে এ সংবাদে পাগলের মত সে তাহার কাছে ছুটিয়া গেল কেন? পৃথিবীতে এমন ব্যাপার ত প্রতি দিন কত হইতেছে। কই, তাহা শুনিয়া ত তাহার কোন দিনই এমনিভাবে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় নাই!

গীতা প্রথম হইতেই ভুল করিয়া আসিয়াছে। নির্ম্মাল্য

যে বিবাহ করার পর হইতেই তাহাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিবে, এই ধারণাই তাহার প্রথম ভুল। নির্ম্মাল্য ত কোন দিনই তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবহেলা করে নাই! অবহেলা যদি কেহ কাহাকেও করিয়া থাকে, তবে সেই নির্ম্মাল্যকে করিয়াছে। এই অবহেলার পরিবর্ত্তে নির্ম্মাল্য তাহাকে সম্মান ছাড়া আর কিছুই দেয় নাই,—তাহার ব্যবহারের কোন দিক দিয়া অপমানের গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গীতার মস্ত বড় ভ্রম যে, এ জিনিষটা তাহার চোখে পড়ে নাই সে বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই,—কত বড় একটা হৃদয় নির্ম্মাল্যের প্রতি ব্যবহারের পিছনে লুকানো আছে। সব চেয়ে বড় ভুল তাহার বুঝিবার যে, তাহার ভিতরেও একটা মস্ত বড় নারীর প্রাণ সজীব আছে,—আদরে, ভালবাসায় সে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে না। নির্ম্মাল্যের বিরুদ্ধে যত বড় সংস্কার লইয়াই সে জীবন পথে অগ্রসর হউক না কেন, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় এক দিন না এক দিন ভরিয়া উঠিবেই। তাহার হৃদয়-দুয়ার চিরদিন এ সংস্কার দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকিবে না,—এক দিন না এক দিন তাহা উন্মুক্ত হইবেই। গীতা আজ তাহার ভ্রম বুঝিল। সে বুঝিল যে, অলক্ষিতে সে নির্ম্মাল্যকে ভালবাসিয়া

ফেলিয়াছে। নারীর প্রাণ লইয়া ইহা ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় ছিল না। খেয়ালের পরদা যদিও এত দিন সমস্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল,—আজ সহসা এক আঘাতে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া হৃদয়ের আসল কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

গীতা হাসপাতালে পৌঁছিয়া দেখিল যে, নির্ম্মাল্যের ব্যাণ্ডেজ করা হইয়া গিয়াছে,—সে অচৈতন্য অবস্থায় খাটিয়ায় পড়িয়া আছে। নির্ম্মাল্যের অবস্থা দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার বক্ষ সেখানে ছিঁড়িয়া দিতে। নির্ম্মাল্য যাইতে বসিয়াছে,—সে বুঝি জানিয়া গেল না, গীতা তাহাকে কত ভালবাসে। অবহেলা লইয়াই সে চলিয়া গেল—ভিতরের আসল জিনিষ দেখিবার তাহার সুযোগ হইল না।

ডাক্তার গীতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার স্বামীকে সে হাসপাতালে রাখিয়া যাইতে চায়, না বাড়ী লইয়া যাইতে চায়। তাহার যেমন অবস্থা, তাহাতে তাহাকে নাড়া না নাড়া উভয়ই সমান। সে যদি তাহার স্বামীকে বাড়ী লইয়া যাইতে চায় তবে কলেজের ambulance গাড়ীতে তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে পারা যায়। গীতা তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবে স্থির

করিল। যাহাই হউক না কেন, নির্ম্মাল্য একমাত্র তাহারই জিনিষ,—যাহা হইবার তাহা তাহার চোখের উপরই হউক। নির্ম্মাল্যকে বাড়ীতে আনিয়া বড় কয়েকজন ডাক্তার ও পিতাকে খবর দিয়া গীতা তাহাকে লইয়া বসিল; আজ তাহার স্পর্শ তাহার দেহ মন সচকিত করিয়া তুলিল।

তাহার মনে পড়িল আগের কথা,—এমনও দিন ছিল, যখন নির্ম্মাল্যের স্পর্শ তাহার কাছে বৃশ্চিক দংশনের মত লাগিত। আজ কেমন করিয়া কি এক মোহন স্পর্শে তাহা অমৃতের সিঞ্চন অপেক্ষাও মধুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্ম্মাল্যের একখানা হাত নিজের গালের উপর রাখিয়া গীতা নিজের জীবনের কথাই ভাবিতে লাগিল। নির্ম্মাল্য ছাড়া আজ আর তাহার ভাবিবার অন্য কিছুই নাই,—তাহার হৃদয় আজ নির্ম্মাল্যময়। অন্য কোন কথা তাহার মনে হইল না। অন্য সমস্ত ভাবনা চিন্তা তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। সুশীল দূরে পড়িয়া রহিল, কুশল ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। তাহার অন্তর জুড়িয়া রহিল নির্ম্মাল্য,—একমাত্র নির্ম্মাল্যেরই আকুল ভাবনা।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিলেন ও তাঁহার একজন সহকারীকে রাত্রিতে থাকিতে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। বিশেষ আশা তিনি দিয়া যাইতে

পারিলেন না। তবে আশা তিনি একেবারে ছাড়েনও নাই।

গীতা প্রায় অসাধ্যই সাধন করিল,—চিকিৎসায়, সেবায়, শুশ্রূষায়, সে দিনে দিনে নির্ম্মাল্যকে আরোগ্যের পথে টানিয়া আনিতে লাগিল। নির্ম্মাল্যের আয়ুর জোরেই হউক, গীতার আকুল প্রার্থনার বলেই হউক, বা ডাক্তারের ঔষধ ও গীতার একান্ত শুশ্রূষার গুণেই হউক, অথবা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির গুণেই হউক, নির্ম্মাল্য এ যাত্রায় প্রায় কালের কবল হইতেই উদ্ধার পাইল।

সে একটু ভাল হইলে, গীতা তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল। নির্ম্মাল্য কিছুই বলিল না,—সে চুপ করিয়া তাহাকে কাঁদিতে দিল। পরিশেষে গীতাকে বুকে টানিয়া লইয়া পরম আদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল, "সত্যি গীতা, প্রেমান্ধ হয়ে আমি তোমার দিকটা চেয়ে দেখ্‌তে পারি নি। তোমার উপর অবিচার করেছি, কিন্তু সবই আমার প্রেমের জন্য। আমার প্রেমের ভিত্তিটা শক্ত ছিল বলেই, আজ আমি তোমাকে ফিরে পেয়েছি।"

গীতা কাঁদিয়া ফেলিল। "ও সব কথা বলে আর

আমাকে অপরাধী করো না গো। মানুষ আমি,—ভুল করেছিলাম, আজ ভুল বুঝ্তে পেরেছি,—আমাকে ক্ষমা করো।"

"তোমাকে ক্ষমা করবার তো কিছু নাই ভুল আমার। কিন্তু সমস্ত ভুলের মাঝেও আমার একটা জিনিষ খাঁটি ছিল,—সে তোমার উপর ভালবাসা।"

"তাই ত আমাকে আরও অপরাধী করে তুলেছে। ওগো, পুরানো কথা সব ভুলে যাও। এস, আজ থেকে আমরা নতুন করে জীবন আরম্ভ করি। আজ যে আমার নবজীবন।"

"সত্যি গীতা, আজ আমাদের নবজীবন। অতীত মুছে গেছে, ভবিষ্যৎ জান্তে চাহ না। এটুকু শুধু উপভোগ কর্তে চাই যে, তুমি আমার, আর আমি তোমার। আজই যে আমাদের সত্যি বিয়ে" এই বলিয়া নির্ম্মাল্য গীতাকে আবেগে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ওষ্ঠে প্রগাঢ় চুম্বন ঢালিয়া দিল। তখন প্রভাতের শান্ত অরুণরাগ জানালার ফাঁক দিয়া গৃহের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল।

শেষ পর্য্যন্ত গীতারই পরাজয় হইল। কুশল সম্বন্ধে সামান্য আপশোষ ছাড়া তাহার পিতার এমন বিশেষ কিছুই হইল না। যে শিক্ষা তাঁহাকে দিবার জন্য গীতা নির্ম্মাল্যকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার কিছুই তাঁহার হইল না। নির্ম্মাল্যও তাহার সুগভীর ভালবাসার বলে গীতাকে শেষ পর্যান্ত সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইল। শেষ পর্য্যন্ত গীতা নিজের ভুল বুঝিল। এ কি শুধু গীতার পরাজয়? এ ভুল বোঝার মাঝে কি পরাজয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না? ভুল স্বীকারের মাঝেও ত জয়ের ধ্বনি বাজিয়া উঠে। ভুল পথে যাওয়াই পরাজয়, ভুল সংশোধনে জয় ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমরা তাহাকে জয়ী ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত করিতে পারিব না।

কুশল বিলাত হইতে ফিরিয়া রাস্তায় এলাহাবাদে দুদিন থাকিয়া আসিয়াছিল। মৈত্রেয়ীর সংসর্গে তাহার চিত্ত নূতন আবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলেই মৈত্রেয়ী রাঙ্গা

হইয়া উঠে। তাহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু বিষম সমস্যায় তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিবাহই সব চেয়ে সহজ সিদ্ধান্ত। মৈত্রেয়ীর মতন মেয়ে লাভ করা যে কোন পুরুষেরই পরম সৌভাগ্য। তাহাকে পাইয়া যে কোন পুরুষ সুখী ও ধন্য হইতে পারিবে। মৈত্রেয়ী তাহাকে ভালবাসে; এমন অবস্থায় তাহাকে লাভ করা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি থাকিতে পারে? সহসা গীতার স্মৃতি মনে আসিতেই তাহার সমস্ত চিন্তায় বাধা পড়িয়া গেল, সমস্যা আসিয়া সমস্তের গতিরোধ করিয়া বসিল।

গীতা নির্ম্মাল্যকে বিবাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে নিজ মুখেই তাহাকে বলিয়াছে যে, এ বিবাহ সে অন্তরের ভিতর স্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার একনিষ্ঠ ভালবাসা চিরদিনই কুশলকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকিবে। কেবল পিতাকে মর্ম্মান্তিক শিক্ষা দিবার জন্যই সে নির্ম্মাল্যের হাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কি তাহার উচিত হইবে, অন্যের হাতে নিজের মন সমর্পণ করা? গীতা শুনিলেই বা কি মনে করিবে? তাহার বিবাহের বার্ত্তা কি গীতার মনে নির্দ্দয় ভাবে আঘাত দিবে না? গীতার

প্রতি প্রাণ-ঢালা ভালবাসা লইয়া ইহাই কি তাহার শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য হইবে !

কুশল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গীতার সহিত সে দেখা করিতে পারে নাই,—সঙ্কোচ আসিয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিবার দুদিন পরে একদিন প্রভাতে কুশল মিঃ ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইল।

"কুশল,

এবার তোমার এখানে অবস্থিতির সময়ে আমি একটা বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করেছি। তোমার ও মৈত্রেয়ীর মাঝে সম্পর্কের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে এসে পড়েছে। এমন একটা আশা অনেক দিন হতেই আমার মনের কোণে উঁকি মেরেছিল। তোমাদের এবার দেখে আমার সে আশা আরও দৃঢ় হয়েছে। আমি তোমার নিজ মুখ হতে জান্‌তে চাই, আমার সন্দেহ ঠিক কি না ? মৈত্রেয়ী সম্বন্ধে তোমার মনের ভাব কি ? তুমি যদি তাকে ভালবাস, তবে বোধ হয় এখন আর তাকে তোমার গ্রহণ কর্‌তে কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না। তুমি সক্ষম হয়েছ. ইচ্ছা করলেই তুমি এখন বিয়ে কর্‌তে পার। যদি মৈত্রেয়ীকে তুমি ভালবেসে থাক, তবে তার মত জিজ্ঞাসা

করতে পার। আমার খুবই বিশ্বাস, সেও তোমাকে ভালবাসে। উভয়ে যদি উভয়কে ভালবাস, তবে ত এখন আর কোন বাধা নাই। আমরাও সুখী হতে পারি। তোমার মত পাত্রের হাতে কন্যা দান করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চিঠি পাইয়া কুশল নানা চিন্তায় ডুবিয়াছিল; এমন সময় নির্ম্মাল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত কুশলের আগে আলাপ ছিল না, এই প্রথম আলাপ নির্ম্মাল্য কুশলকে গীতার হইয়া সে রাত্রে তাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া গেল।

রাত্রে কুশল গীতার বাড়ী গেল। কত দিন যাবৎ সে গীতাকে দেখে নাই,—তাহার ভিতর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কুশল আশঙ্কা করিয়াছিল যে, গীতা ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, ম্লান হওয়া ত দূরের কথা, সে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেই চিরপ্রফুল্ল মুখে এখনও সর্ব্বদা তেমন হাসি লাগিয়া আছে। কুশল অবাক্ হইয়া গেল,—ভিতরে এত বড় ব্যথা বহিয়া কেমন করিয়া সে মুখে প্রফুল্লতা আসিতেছে।

খাওয়া দাওয়ার শেষে গীতা তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "কুশল, একটা কথা তোমাকে সর্ব্ব প্রথমই বলা উচিত ছিল; কিন্তু নিভৃতে না পাওয়ায় বলতে পারি নাই।

আমার আগেকার কথা ভুলে যাও,—সে সব অতীত, সমস্ত ভুল। স্বামীকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, সুখের সন্ধান আমি পেয়েছি। সব কথা ভুলে গিয়ে এটুকু শুধু মনে রেখো যে, আমরা আজীবন সুহৃৎ,—চিরদিন তাহাই থাক্‌ব।”

বাসায় ফিরিবার সময় গাড়ীতে কুশল গীতার কথা-গুলিই ভাবিতেছিল। গীতা স্বামীকে পাইয়া সুখের সন্ধান পাইয়াছে,—সে তাহার আজীবন সুহৃৎ,—তা ছাড়া আর কিছুই নয়! মৈত্রেয়ীর কথা তাহার মনে জাগিল,—তাহাকে পাইয়াও কি কুশল এমনি সুখী হইতে পারিবে না! কেন পারিবে না? মৈত্রেয়ী তাহাকে ভালবাসে, আর সমস্ত অতীত সত্ত্বেও সেও যে তাহাকে ভালবাসে না, তাহা নয়। এত দিন গীতা তাহার বন্ধন ছিল,—আজ সেই নিজ মুখে তাহাকে কবুল জবাব দিয়াছে,—সে সুখী হইয়াছে, সে এখন তাহার বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাসায় ফিরিয়াই কুশল দুইখানা চিঠি লিখিল—একখানা মিঃ ব্যানার্জ্জির চিঠির উত্তর; অন্য খানা মৈত্রেয়ীর নামে।

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ।৵০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ।৶০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ **পত্র দিতে হইবে।**

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

১। অভাগী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দুর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (৩য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০। ছালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
২৩। সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীল মাণিক—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট।

৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৩৩। মায়ের প্রসাদ (২য় সং)—শ্রীবারেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম এ

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৩য় সংস্করণ) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত. এম-এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী-সম্পাদক।

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল।

৪৮। ছবি (২য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। মনোরমা—শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

৫০। সুরেশের শিক্ষা (২য় সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর(২য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর।

৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।

৬৩। প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল।

৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৬৬। পাপীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ।

৬৭। চতুর্ব্বেদ (সচিত্র)—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন।

৬৮। মাতৃহীন—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল।
৭২। জীবন সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭৪। বাজীকর—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
৭৫। স্বয়ম্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু।
৭৬। আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত সেন।
৭৭। বরপণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৭৮। আহুতি—শ্রীমতী সরসীবালা বসু।
৭৯। অন্ধা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।
৮০। মণ্টুর মা—শ্রীচরণদাস ঘোষ।
৮১। পুষ্পদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮২। রক্তের ঋণ—শ্রীনরেশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।
৮৩। ছোড় দি—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৮৪। কালো বৌ—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি।
৮৫। মোহিনী—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ।
৮৬। অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।
৮৭। দিল্লীশ্বরী (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮৮। সুরের মায়া—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮৯। আনন্দ-মন্দির—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল।
৯০। চিরকুমার—অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ।
৯১। নারীর-প্রাণ—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-এ।
৯২। পাথরের দাম—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি টি (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা